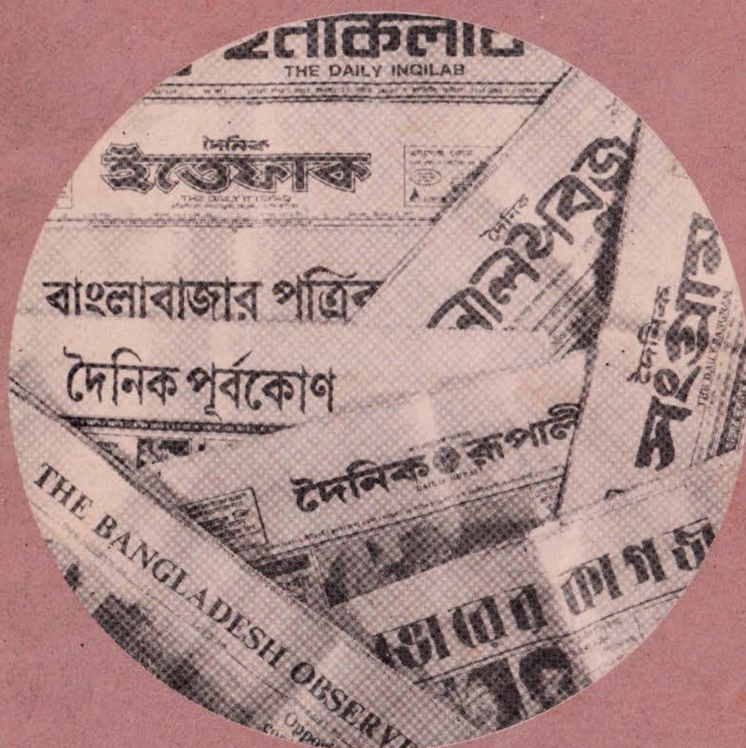
মোল্লাতন্ত্র !!



জাতীয় পত্র—পত্রিকার দৃষ্টিতে

প্রকাশনায় ঃ দেশপ্রেমিক সংঘ

ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের দেশ এক ভীষণ নীতিগত অস্থিরতায় ভূগছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা যেন আমাদের গন্তব্যের যাত্রাপথ হারিয়ে ফেলছি। তাসত্ত্বেও এটি অত্যন্ত আশার কথা যে, আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীগণ এক্ষেত্রে এক সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলছেন। তাঁরা জাতির অনভিপ্রেত আশঙ্কা ও বিপদাবলী সম্বন্ধে জাতিকে সোচ্চার করে বার বার সঠিক দিন-নির্দেশনা প্রদান করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সবাই তো আর সব পত্রিকা একসঙ্গে পড়ার সুযোগ পান না। তাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধমালার সংকলন মাঝে মাঝে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করি যেন বুদ্ধিজীবীদের মুল্যবান সুচিন্তিত মতামত সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়।

প্রবন্ধমালার লেখকগণ নিশ্চয়ই জনগণের কাছে তাঁদের মতামত ও চিন্তাধারা অধিক হারে পৌছে দিতে আগ্রহী। এসব প্রবন্ধমালা যদিও বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তথাপি তাদের বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী এত বিস্তৃত ও জীবন্ত যে, এগুলো জনসাধারণের জানা দরকার। তাই আমরা খাঁটি দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়া তাঁদের চিন্তাধারার আলোকবর্তিকা দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে লেখক মহোদয়গণ ও উল্লেখিত পত্রিকাসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করছি। আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। তাই প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সোচ্চার করার উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত মোল্লাতন্ত্র শীর্ষক পুস্তিকাটির ৩টি খন্ডকে একত্রিত করে পুনর্মুদ্রণ করা হল।

বিষয় সূচী ঃ

পূণর্মুদ্রণ ঃ
এপ্রিল ১৯৯৩

শুভেচ্ছা বিনিময় পাঁচ টাকা।

আবার সাম্প্রদায়িকতা

আতাউস সামাদ

একাগ্রতার স্বপ্ন বিনিময়ে
মেঘ চেয়েছি ভিজিয়ে নিতে
যখন পোড়া মাটি
বারেবারেই তোমার খরা
আমার ক্ষেতে বসিয়ে গেছে ঘটি।
বাংলা ছাড়ো,

– *সিকান্দার আবু জাফর*

উনিশ শ' একাত্তর সালে আমরা যখন যুদ্ধ করে পাকিস্তানী বর্বরদের পরাধীনতা থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করি তখন অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব হারানোর প্রচন্ড শোকের মধ্যেও বুকটা হালকা লাগত। মনে হতো তাঁদের ব্যাথায় বুকের ভেতর হৃৎপিন্ড প্রতিদিনই মাঝে মাঝেই মুচড়ে গেলেও সেই বোঝাটা ছিল সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতার আর ধর্মীয় গোঁড়ামির নৃশংসতার।

সেই সমস্ত বিভৎস ও নৃশংস কিছু দৃশ্য সচক্ষে দেখতে হয়েছিল পাকিস্তানী জামানায়। সেই জন্যই বোধ হয় দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও তাদের বাংলাভাষী দোসরদের আত্মগোপনের পর হাল্কা লাগছিল এই ভেবে যে, অন্ততঃ এই দু'টো উৎপাত বিদায় হয়েছে।

কাশ্মীরের 'হযরত-বাল' ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের কলকাতায় আর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, ঢাকা ও ডেমরাতে প্রচন্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল। আমাদের এলাকায় এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু করতে ইন্ধন যুগিয়েছিল সামরিক শাসক স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁ ও তার বেতনভুক্ত রাজনৈতিক চাকরগুলো। সেই সময় ডেমরায় যেদিন হিন্দুদের ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয় সেদিন ওই ঘটনার খবর পেয়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। আমিও গিয়েছিলাম। আমরা দেখতে পাই যে, শুধু ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া নয়, খুনোখুনিও শুরু হয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখলাম মাঠের ধারে রাস্তায় পাশে দাঁড়ান একজন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সাথের পুলিশদের নির্দেশ দিচ্ছেন, 'গুলি করো, গুলি করো' কিন্তু তারা গুলি করতে পারছে না কারণ লক্ষ্যবস্তু দূরে এবং কেবলই

এদিক-ওদিক ছুটছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে খেয়াল করলাম সামনে, বিস্তৃত ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় করে একটা মানুষ পালাবার চেষ্টা করছে আর আরো তিনটা ঘোড়ায় করে অন্য তিনজন তাকে ধরার ও খতম করার চেষ্টা করছে। পুলিশ গুলি করতে পারছে না কারণ গুলি কার গায়ে লাগবে কে জানে? যতদূর মনে পরে রাগে-দুঃখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

এই সময় ঘড়ঘড় করে একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল আর দেখলাম পুলিশরা সবাই এবার রাস্তার অপর পারে ছুটল। একজন বল্লেন যে, নিহতদের লাশ ও আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার জন্যে তোলা হবে ট্রাকে। পুলিশ কনষ্টেবলরা সেই কাজে গেলেন। আমরাও পিছু নিলাম। নিষ্প্রাণ ক'টি দেহের সাথে কিছু অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আহত ব্যক্তিকেও শুইয়ে রাখা হয়েছিল। কে বেঁচে আছেন আর কে মারা গেছেন বোঝা যাচ্ছিল না। নিহত ভেবে একজন মহিলাকে পুলিশরা যখন তুলতে গেলেন তখন অবচেতনভাবেই তাঁর একটা হাত নড়ে উঠে তাঁর হাটুর ওপর উঠে যাওয়া শাড়িটা চেপে ধরল। তবে তার চোখ খুলল না। তবু লজ্জা নিবারণের জন্য তার হাত নড়ে ওঠায় আমরা সবাই জানলাম যে, তিনি জীবিত। পুলিশরা তাঁকে ট্রাকে আহতদের সারিতে শুইয়ে দিলেন। আজ বলতে পারব না যে, ওই মহিলা হাসপাতাল পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে বেঁচেছিলেন কিনা। অথবা ঘোড়-সওয়ার শেষ পর্যন্ত প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা। স্থানীয় কেউ বলেছিলেন আহত মহিলাটি ছিলেন দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে পলায়নরত ঘোড়-সওয়ারের স্ত্রী।

ওই দৃশ্যটি এখনো মাঝে মাঝেই মনে পড়ে, বিশেষ করে শীতলক্ষ্যার দিকে গেলে।

একই রাস্তায় গেলে আরো একটি দিনের কথা মনে পড়ে। দিনটি ছিল ১৯৭১-এর মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলের শুরুতে।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্তুগুলোর কামড়ে আঁচড়ে তখন ঢাকা নগরী ছিন্নভিন্ন। আমাদের পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালী সৈন্যদের, শ্রমিকদের এবং ছাত্রদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে ইতিমধ্যেই। পাকিস্তানী সৈন্যরা যেমন ইচ্ছা তেমন অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে। তাই আম্মা, স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে ঢাকা থেকে পালাব বলে ঠিক করলাম। মার্চের শেষ দিনটি বা তার আগের দিনটিতে ডেমরা ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। ওখানে নৌকা ঠিক করতে করতে দেখি দিনের বেলাতেও দক্ষিণ দিকের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। প্রথমে বুঝিনি কিন্তু যখন আরেকজন শরণার্থী বললেন যে, ওটা আগুন তখন বুঝলাম কোথাও একটা গ্রাম জ্বলছে। তবে বুঝিনি কোথায় আর কিভাবেই বা আগুন লাগল।

ঘাটের দিকে চললাম। কিন্তু নৌকায় উঠে বসতে না বসতেই গিন্নী বললেন যে, তিনি যাবেন না। তাঁর কোলে আমাদের ছোট মেয়ে দেড় মাসের শান্তা অজ্ঞান হবার মতো নেতিয়ে পড়ে আছে। শান্তার আম্মা বল্লেন, 'ওতো পথে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ঢাকায় পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তার আগে অন্তত: মেয়ের চিকিৎসার চেষ্টা করবো। না হয় কারো কাছে দিয়ে যাবো।' আম্মাকে এক ভাইয়ের সাথে নৌকায় করে গ্রামের বাড়ির দিকে রওয়ানা করে দিয়ে আমরা ঢাকার দিকে ফিরলাম। নদীর পাড় ধরে উপরে উঠতে উঠতে দেখলাম আকাশের কোল ঘেঁসে লালটা আরো উঁচু ও আরো বিস্তৃত হয়েছে।

সেদিন ডি-এন-ডি খালের পাশের রাস্তা ধরে ফেরার সময় আপনা থেকেই আরো অনেকবার চোখ ফিরে গিয়েছিলো দিগন্ত জোড়া ওই লেলিহান শিখার দিকে। কারো মুখে কথা সরছিলো না। মাঝে মাঝে আড় চোখে প্রায় অচেতন শান্তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কে জানে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, দেশের মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

সেদিন ঢাকায় পৌছবার আগেই শুনেছিলাম পাকিস্তানীরা সেদিন আগুন দিয়েছিল জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ জুড়ে। গেন্ডারিয়া-পোস্তগোলাতেও নরমেধ যজ্ঞ চালিয়েছিল তারা। তাদের মুখে হুঙ্কার ছিল, 'হিন্দু লোগকো মারো, জয় বাংলাওয়ালাকো মারো।' ওরা সেদিন নাকি আমাদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' করছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই এদের সাথে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদের ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী আর মুসলিম লীগের লোকেরা।

তবে যা বলছিলাম। ওই দু'টি দৃশ্য আজও চোখের সামনে নেচে বেড়ায়। মনে হয় সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতা লকলকে জিভ বেড়ে নাচছে আর ওই জিভ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে। ভারতের বাবরী মসজিদ নিয়ে উত্তেজনা চলার সময় চট্টগ্রাম ও ঢাকায় যে হাঙ্গামা হয়েছিল ১৯৯০ সালে তখনও ওই ছবিগুলো চোখে ভাসছিল। আশঙ্কা হচ্ছিল, আমাদের দেশে আবারো অমনটা হবে নাকি? ভারতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলতে থাকলে সেইজন্যেই বাংলাদেশে এখনো আমাদের গা শির শির করতে থাকে, ওই বুঝি সেই রক্তলোভী পিশাচটা আবার এলো।

দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্বিতীয়বার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। এই ভেবে যে, স্বৈরাচারী আর ভন্ড পীরদের ষড়যন্ত্রের সাম্প্রদায়িকতা চালিয়ে দেয়া বোধ হয় বন্ধ হলো।

কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে, সম্প্রতি এক সপ্তাহের মধ্যে কক্সবাজার জেলায় প্রথমে একদল বিক্ষুব্ধ মুসলমান আক্রমণ করলো খৃষ্টান পাড়া, তারপর শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী খাগড়াছড়ি জেলার ত্রিপুরা উপজাতীয়রা আক্রমণ করল খৃষ্টানদের দু'টো শিক্ষালয় ও উপাসনালয় এবং তৃতীয় ঘটনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে হামলা চালাল আরেক দল উগ্র ধর্মান্ধ লোক। স্পষ্ট অভিযোগ এসেছে শেষোক্ত স্থানের ওপর হামলাকারীরা পাকিস্তানী মওদুদীর অনুসারী।

আমার বারবার মনে হচ্ছে ১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৭১-এ যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এখন তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের ফিরে পাওয়া গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। ১৯৯০ সালে ঢাকার পুরনো এলাকায় বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া উপদ্রুত এলাকার একদম ভেতরে চলে গিয়েছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে। আজকের প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে তখনকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে, সেদিনের ষড়যন্ত্র আজও শেষ হয়নি। তাই তাঁকে এখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আরো জোরদার ভূমিকা নিতে হবে।

আজকে যেসব গণতন্ত্রকামীরা সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন অধ্যাদেশের বিরোধিতা করার জন্য সংসদ ছেড়ে রাজপথে নেমেছেন এবং ক্ষমতাসীন যাঁরা সংসদে বসে নিজেদের গোঁ ও সন্দেহপরায়ণতা আঁকড়ে ধরে রেখে সংসদের সিদ্ধান্ত নেবার প্রথাকে দুর্বল করছেন তাঁদের উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করি মনে রাখবেন গণতন্ত্রের অনেক শত্রু। তাই শত চেষ্টা করে হলেও আপনাদের বিতর্ক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংসদের ভেতর ধরে রাখুন। দেশকে উত্তপ্ত হতে দেবেন না। সাম্প্রদায়িক শক্তিরা ফিরে এসেছে, তাদেরকে উন্মত্ততা করার সুযোগ করে দেবেন না। গণতন্ত্র নষ্ট হবার পথ করে দেবেন না।

বিতর্কিত অধ্যাদেশটি নিয়ে যদি জাতীয় সংসদ ফয়সালা করতে না পারে তাহলে সুপ্রীম কোর্টে যান। তবু শান্তভাবে কাজ করুন।

খরার সুযোগে বাংলার ক্ষেতে যারা বরাবর ঘটি বসিয়ে গেছে তারা আবারো এদেশেরই আনাচে কানাচে ওঁৎ পেতে বসে আছে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করার ব্যবস্থা করুন।

❑ *নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা 'সাপ্তাহিক প্রবাসী'*
৮ম বর্ষ ৪৬ শ সংখ্যার সৌজন্যে।

স্বৈরাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মৌলবাদের বিস্তার ঃ এপিঠ - ওপিঠ

।। ভাষ্যকার ।।

আফগানিস্তানে শীত আসছে। যত তা নিকটবর্তী হচ্ছে তত শঙ্কা বাড়ছে মানুষের মনে। জ্বালানি সঙ্কট ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। তার উপর বাইরে থেকে সরবরাহ বন্ধ। আনা নেওয়ার রাস্তাগুলো কোনো না কোনো সশস্ত্র গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে। ফলে নিশ্চিন্তে আনানেওয়া করা কঠিন। নজিবুল্লাহর পতন হলো অনেকদিন। এর মাঝে নির্বাচিত সরকার প্রতিনিধি হবার কথা ছিলো, তা সম্ভব হয়নি। সমস্ত দেশটাতে বলতে গেলে অস্তিত্ব নেই কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের, যে গেরিলা বাহিনীগুলো নজিবুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো তারা কোনো সময়ই অধীন ছিল না একক নেতৃত্বের। আজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই গেরিলা বাহিনীগুলো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আগে নজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে সবাই লড়াই করায়, লড়াই করার উদ্দেশ্যের যে ঐক্য ছিল বর্তমানে তা নেই, ফলে আশঙ্কা বাড়ছে পারস্পরিক সংঘর্ষের।

কার্যতঃ মৌলবাদ প্রভাবিত আরেকটি দেশ পাকিস্তান, সেখানেও ধর্মীয় সংঘাত বাড়ছে বিভিন্ন মতের অনুসারীদের মধ্যে। এই সংঘাত এক ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সাথে আরেক ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নয়। একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন মতের অনুসারীদের মাঝে। তাছাড়াও আছে সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মোহাজের, পাঠান সংঘর্ষ। আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় যে পরিমাণ অস্ত্র আফগান সরকার বিরোধী তথাকথিত মুজাহিদদের দেওয়া হয়েছে তার কিছুটা নানাভাবেই হস্তগত হয়েছে পাকিস্তানের জনগণের। অস্ত্র আজ আর দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার নয়, বরঞ্চ খুবই সুলভ। তার উপর মাদক দ্রব্যের জমজমাট ব্যবসার বদৌলতেও অস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে নানা জায়গায়। এভাবে যে বাহিনীগুলো গড়ে উঠছে তাদের আবার নানা কাজে ব্যবহার করছে নানা রাজনীতিক মহল থেকে শুরু করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নানা শক্তি। বস্তুতঃ নানাভাবেই আজ দেশটিতে সশস্ত্র সংঘাতের তীব্রতা বাড়ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর মধ্য এশিয়ার প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব বেড়েছে, এই শক্তিগুলো শুধু যে

তৎপরই তা নয়, বলতে গেলে তারাই সমাজে বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী। এই রাষ্ট্রগুলো যে কোনো সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রপুঞ্জের অঙ্গীভূত ছিল ভাবতেও অবাক লাগে তা।

ধর্মীয় মৌলবাদ প্রভাবিত আরেকটি রাষ্ট্র ইরান। সে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার খুব বেশী উপায় নেই। অভ্যন্তরীণ সংঘাত সে দেশে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মতো না হলেও (যদিও কুর্দীদের অবস্থা বর্তমানে সেখানে কিরূপ তা বিশ্ববাসীর ঠিক জানা নেই) অর্থনৈতিক অবস্থা সে দেশের যে মোটেও ভালো নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তেল আছে বলে সে দেশ এখনো পার পেয়ে যাচ্ছে। তবে তাছাড়া আর কোনো দিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কোনো খবর জানা নেই।

বস্তুতঃ বিগত দশকে ধর্মীয় মৌলবাদের যে উত্থান নানা দেশে দেখা গেছে তার ফল আর যাই হোক ভালো হয়নি সে সব দেশের জন্য। স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বিকাশ যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, সহায়তার পরিবর্তে সমস্যাই সৃষ্টি হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ধর্মীয় মৌলবাদ, তা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ যে রাষ্ট্রগুলো তেলের টাকা দিয়ে দেশের আধুনিক যুগের সূচনা করার প্রয়াস পেয়েছে তারা আধুনিক রাস্তাঘাট, বাড়িঘর তৈরি করতে পারলেও বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বহুল পরিমাণে সম্প্রসারণে সক্ষম হলেও এমনকি জনগণের বিভিন্ন অংশের অবস্থাও আগের চেয়ে উন্নত করতে সক্ষম হলেও উৎপাদক শক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে সে দেশগুলো পরিণত হয়নি পূর্ব এশিয়ার নব্য শিল্পায়িত দেশগুলোর মতো কোনো রাষ্ট্রে। এমনকি লিবিয়ার দিকে তাকালেও তা বোঝা যায়।

কিন্তু তারপরও ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব যে কমছে তা বলা যায় না। অন্য দেশের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশের দিকে তাকালেও তা বুঝতে পারি আমরা। নানা দেশের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সামনে থাকার পরও জনতার বিভিন্ন স্তরের মাঝে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব ও ধর্মীয় প্রভাবকে এক করে দেখে উপরোক্ত মন্তব্য করছি না। ধর্মীয় প্রভাব আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তা থাকবে। তা এক জিনিস আর ধর্মাশ্রয়ী রক্ষণশীল রাজনীতিকে সমস্যার সমাধান মনে করা আরেক জিনিস। আমাদের দেশের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যর্থতার কারণেই রাজনীতির অঙ্গনে রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান ক্রমশঃ সংহত করতে চেষ্টা

করছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদে উৎপাদক থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত মানুষেরাই বেশি করে আকৃষ্ট হয় মৌলবাদের দিকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আশাহত হয়ে অগ্রগতির গতি হিসেবে আকৃষ্ট হয় তাদের প্রতি। ইরানে তাই ঘটেছিল শাহবিরোধী অভ্যূত্থানের সময়। জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী শক্তির দুর্বলতা (দমন-নীতিসহ নানা কারণেই এ দুর্বলতা) প্রকট হয়ে উঠেছিল ইসলামী বিপ্লবের আগে। একই অবস্থা হয়েছে বর্তমান আলজেরিয়া ও মিসরে।

বাংলাদেশে গত পনেরো বছরে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে মোট জনসংখ্যার তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও আগের তুলনায় সংখ্যায় অনেক এবং প্রভাবশালী স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বিকাশ লাভ করেছে। সমাজের এই অংশের উপর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব সামনে রেখে গণতান্ত্রিক ধারার মুখ্য দলসহ এই ধারার অন্যান্য অংশও এই অংশের উপর যাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেজন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে সমাজের যে অংশ বরাবরই ছিল গণতান্ত্রিক ধারার স্বাভাবিক ভিত্তি, অবহেলিত হচ্ছে তারা। শুধু শ্রমিক ক্ষেতমজুর-কৃষকের কথা বলছি না। বলছি বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদে উৎপাদকের কথাও। বাংলাদেশের বাস্তবতায় কৃষকসহ অকৃষি খাতের ক্ষুদে উৎপাদকরাই মুখ্য উৎপাদন শ্রেণী। এদের সমস্যা-সঙ্কটের প্রতি গণতান্ত্রিক শিবিরের বর্তমান অবহেলা মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। যে অংশের কথা বলছি এই অংশের উপর মৌলবাদী শক্তির প্রভাব ইতিমধ্যে সংহত হয়ে গেছে এমন নয়। যা বলতে চাইছি তা হলো, শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে এখানে। ভবিষ্যতে যদি এই অংশের উপর রক্ষণশীল মৌলবাদী শক্তির প্রভাব আরো গভীর হয় তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। শাসকদের দক্ষিণপন্থী রাজনীতির যে প্রভাব দেশের মধ্যে এখনই আছে তা থেকে এক পা এগুলেই মৌলবাদের ধারার দিকে এগিয়ে যাওয়াটা কঠিন নয়।

অন্যদিকে মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বিস্তৃত হলে শেষ পর্যন্ত অবস্থা কি দাঁড়াবে সে ব্যাপারে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে আছে। বর্তমান সরকারের বলতে গেলে সর্বক্ষেত্রের ব্যর্থতাসমূহ এবং তার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ধারার দুর্বলতা আরো বেশি মৌলবাদ প্রভাব দক্ষিণপন্থীর বিপদ ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে এখানে। প্রশ্নটা আগের মতো স্বৈরাচারের প্রত্যাবর্তনের নয়। মৌলবাদ প্রভাবিত আরো দক্ষিণপন্থীর চরিত্র আগের স্বৈরাচারের চেয়ে খুব পৃথক হবে না।

প্রশ্ন হলো, গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এ ব্যাপারে সচেতন হবে কি? নাকি বর্তমানে তারা যেভাবে এগুচ্ছে সেই ধারাতেই যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

❑ *সাপ্তাহিক একতা, ১৯৯২, সংখ্যা ৪৫-এর সৌজন্যে।*

মৌলবাদের সঙ্গে আপস আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে

মুনতাসীর মামুন

বাবরি মসজিদ নিয়ে হাঙ্গামা চলছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। কংগ্রেস সরকারের চরম ব্যর্থতা এই যে, মসজিদের ওপর হামলার ঘটনাটা তারা ঘটতে দিলেন এবং উপমহাদেশে স্বার্থান্বেষী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদীদের সুযোগ করে দিলেন প্রভাব বিস্তারের। কারণ, এ উপমহাদেশ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে প্রতিক্রিয়াশীলতা চাষের সবচেয়ে উর্বর ভূমি। এর মুল্য অচিরেই কংগ্রেস সরকার ও দল এবং ভারতীয় জনগণকে দিতে হবে।

ভারতে যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদ প্রতিটি মানুষই করবেন তিনি মুসলমান, হিন্দু যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন। কারণ, কোনো ধর্মই বলে না অপর ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয়ে হামলা চালানো বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করার কথা। কিন্তু ভারতে যা ঘটেছে, তার জের আমাদের কেন পোহাতে হলো বা হবে সেটিই আমাদের প্রশ্ন।

সাত তারিখে সকালে দেখেছি মাদ্রাসার ব্যানার হাতে যুবকরা রাস্তায় মিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু তাতে তাদের লোহার রড বা লাঠি কেন? এ দু'টি অস্ত্র থাকার কারণ বোঝা গেলো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যখন হামলা চললো মন্দিরে মন্দিরে ও হিন্দু মালিকানাধীন দোকানে। শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশেই এবং সবখানেই হামলাকারী ছিলো একই রকম। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে কি এ ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় যে, ছাত্ররা উপাসনালয় ভাঙবে এবং রাজনৈতিক দলের অফিস জ্বালাবে।

বাংলাদেশে মুসলমানীত্ব ও ইসলাম রক্ষার একচেটিয়া ইজারা এসব মাদ্রাসার ছাত্র, কিছু সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দেয়া হয়নি। মুসলমান আমরাও এবং ধর্মকর্ম আমরাও জানি। ধর্মের নামে অধর্ম, হানাহানি এবং বিকৃতায়ণ শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক রাজাকারদের ক্ষমা ঘোষণা, সামরিক শাসনজাত কারণে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী সংগঠনের পুনরুজ্জীবন এবং আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক দল ও নেতাদের

দায়িত্বহীনতার কারণে। মাদ্রাসায় যদি ধর্মের নামে এই শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে মাদ্রাসার শিক্ষার আমূল সংস্কার করে সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। যারা ইসলামকে মানবতার ধর্মের বিপরীতে হানাহানির ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে, তারা ইসলামদ্রোহী মুরতাদ। যুক্তিতর্ক দিয়ে ধর্ম বোঝা মুরতাদী নয়। একই কারণে, বাবরি মসজিদ যারা ভেঙেছে তারাও ধর্মদ্রোহী। সমন্বয় কমিটি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ও অন্যান্য দাবিতে মাসখানেক আগে ৮ ডিসেম্বর হরতালের ডাক দেয়। দেশব্যাপী এসব দাবির প্রতি সমর্থন যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততোই জামাতে ইসলামী ও তাদের সমমনা দলগুলো মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করে। তাই আমরা দেখি গত কয়েক মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের হামলা ছাড়াও আহমদীয়াদের দু'টি মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, পবিত্র কোরআন পোড়ানো হয়েছে, শিয়া-সুন্নী-আহমদীয়া, হিন্দু-খৃষ্টান দাঙ্গা হয়েছে, বাংলাদেশে যা কখনও হয়নি। বাবরি মসজিদের ঘটনা তাদের এক সুযোগ এনে দিয়েছে। এ কারণেই তারাও হরতালের ডাক দেয় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময়কার কৌশলে। তাদের ধারণা, এতে তাদের জনসমর্থন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হরতাল হতোই, তা রোধের ক্ষমতা সরকারের ছিলো না। এরশাদও কখনও জনসমর্থনপুষ্ট হরতাল ভাঙতে পারেনি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যারা অনবরত ধর্মের কথা বলে, তারা কেন আবুধাবীতে উটের দৌড়ে বাঙালী দুধের বাচাকে ব্যবহারের কারণে বা পাকিস্তানের পতিতালয়ে বাঙালি নারী পাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না? মানুষ তো আশরাফুল মখলুকাত, উপাসনালয়ের চেয়েও বড়। শুধু তাই নয়, কোরআন পুড়িয়ে তারা আবার কিভাবে ইসলামের কথা বলে? প্রশ্ন আরো আছে, আরব, আফ্রিকা, এশিয়ার অন্যান্য দেশে তুরস্কে কেন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় ভাঙা হয়নি বা মানুষের ওপর হামলা হয়নি? ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলমানদের এ কথাগুলো ভেবে দেখা দরকার।

সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র যদি কল্যাণ বয়ে আনতো, তাহলেও না হয় তাকে সমর্থন করা যেতো। নেপালের কথা ধরুন। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। গত ত্রিশ বছর সেখানে চলেছে স্বৈরশাসন। আশি ভাগ মানুষের বাস সেখানে দারিদ্রসীমার নিচে। পশ্চিম এশিয়ায় তো ৮৫ ভাগ মুসলমান। কিন্তু সেখানকার শাসকদের স্বৈরশাসন, তাদের জীবন-যাপনের কথা কি কারো অজানা? এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, মৌলবাদ এক পর্যায়ে চরম সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয় এবং তা পথ করে দেয় ফ্যাসিবাদের। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়নি।

জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আমাদের আবেদন, নিজেদের স্বার্থে, দেশের অগ্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে অভিযানকে দুর্বার করে তোলার ঘোষণা দিন। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে 'সার্ক'-কে অর্থবহ করে তুলতে হলে এটিই হওয়া উচিত প্রধান শ্লোগান।

৮ তারিখের হরতাল দেশে দু'টি প্রধান ধারা তুলে ধরেছে। একটি মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে, অন্যটি সাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। সফল হরতাল প্রমাণ করেছে, সমন্বয় কমিটির দাবিগুলোর প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। দেরীতে হলেও ভারত সরকার সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ করার ও ধর্মের অবমাননাকারীদের শাস্তি দেয়ার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। ভোটের কারণে এই কংগ্রেস একসময় বিজেপিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলো; আজ তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার পথে। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের সরকারী দলেরও এ পরিপ্রেক্ষিতে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে।

❑ ভোরের কাগজ, ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯২-এর
প্রকাশিত 'অতিথি প্রতিবেদন' থেকে।

সাবধান

স্বপন চৌধুরী

বাংলাদেশ একটি বহুমতাদর্শীর দেশ। এই দেশে ভিন্ন মতবাদের, ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন মতবাদের এই বিচিত্রতাই আমাদের মাতৃভূমির সৌন্দর্য। বৈচিত্র্যের ও বিভিন্নতার মাঝে বাংলাদেশ তার ঐক্যকে ভালভাবে ধরে রেখেছে। আমাদের সংবিধানের আট নম্বর ও এগারো ধারামতে গণতন্ত্র আমাদের দেশের মৌলিক নীতিগুলোর অন্যতম। তাই আমরা মনে প্রাণে গণতান্ত্রিক আর আমাদের দেশও একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ ধারা মতে প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারী।

কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশের মৌলবাদীদের তরফ হতে এমন সব দাবি উত্থাপন করা হচ্ছে যদ্দরুন বাংলাদেশের জাতীয়তার ভিত্তিসমূহ ধসে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হচ্ছে। উপাসনালয়ের পবিত্রতাকে পদদলিত করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারকে ধর্মে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা হচ্ছে। উপসানালয়ের পবিত্রতাকে পদদলিত করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারকে ধর্মে হস্তক্ষেপ করার জন্যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এসব কিছুই ইসলামের নামে করা হচ্ছে। আর আমরা এর পরিণামের চিন্তা না করে নীরব দর্শক হয়ে বসে আছি। আমাদের দেশের জনগণ কুফরী ফতওয়া শুনে শুনে অতিষ্ঠ। ফতওয়াসমূহ একত্র করে পরীক্ষা করলে, দেখা যাবে এগারো কোটি লোকের এদেশে একজনও মুসলমান নেই। সবাই একে অপরকে কাফেরের ফতওয়া প্রদান করে রেখেছে। এই কাফের বানানোর কাজ যদি মসজিদ মিম্বর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত, তবুও এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল, কিন্তু এখন তো সরকার ও পার্লামেন্ট পর্যন্ত একাজ বিস্তার করার পাঁয়তারা চলছে। জানি না, আমরা কেন জ্ঞানে ফিরছি না। আত্মোপলব্ধির চেতনা কি আমাদের কাছ থেকে একেবারে পালিয়ে গেল? এই বহমান পৃথিবীর রাজনৈতিক উত্থান পতন হতে শিক্ষা গ্রহণ করছি না কেন? বাংলাদেশে সুপরিকল্পিতভাবে মৌলবাদকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেকের মতে বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করতঃ দেশটার স্থায়িত্ব ও উন্নতিকে ব্যাহত ও পঙ্গু করে দেয়া। এই হীন উদ্দেশ্যে কতিপয় দেশ হতে অর্থ যোগান দেয়া হচ্ছে। ধর্মের

সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। তবে ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও নিগ্রহ নিশ্চয়ই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের জন্যে বিষ ও বিপদস্বরূপ। এতে আমাদের ভিত অবশ্যই ধসে পড়বে। এই মৌলবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামী আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে তা দেখার জন্য কয়েক বছর পূর্বের ইতিহাসের এক অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে যখন কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা হয় তখন একটি ইনকোয়ারী কমিশন গঠিত হয়। সেই আদালতে এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় যে, উলেমার দর্শনের ভিত্তিতে যদি পাকিস্তানে এক ইসলামী সরকার গঠিত হয়, তবে তার পরিচয় কি হবে? পাকিস্তানের আলেমগণ তখন যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমাদের জন্যে অনেক চিন্তার খোরাক দেয়। কেননা আমাদের দেশের উলেমা নিজ পদ্ধতি ও কার্যকলাপে পাকিস্তানের আলেমদের থেকে পৃথক নয়। বরং বর্তমানে পাকিস্তানের অনেক আলেম ও ধর্মীয় সংস্থা আমাদের দেশের আলেমদেরকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ব্যবহার করছে ও দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একটু চিন্তা করে দেখুন আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের মাওলানা আবুল হাসনাত, সৈয়দ মুহাম্মদ আহমদ কাদেরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা তোফেল মোহাম্মদ এবং দেওবন্দীদের মাওলানা আহমদ আলী এবং আবুল হামেদ বাদাউনী সাহেব কি চিত্র অংকন করেন।

সেই আদালতে যখন তাদের প্রশ্ন করা হয় ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলিমদের ভূমিকা কি হবে? দেশের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে কিনা? অথবা আইন প্রয়োগে তাদের কোন অধিকার থাকবে কিনা? সরকারী পদে তারা আসন পাবে কিনা? তখন আলেমগণের উত্তর এরূপ ছিল ঃ

মাওলানা আবুল হাসনাত ঃ- তারা যিম্মী হবে। আইন প্রণয়নের তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। আইন প্রয়োগে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। কোন সরকারী পদে তারা সমাসীন হতে পারবে না।

মাওলানা আহমদ আলী ঃ- তারা যিম্মী হবে এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। আইন প্রয়োগে তাদের অধিকার থাকবে না। কিন্তু সরকার তাদের সরকারী পদ লাভের অনুমতি দিতে পারে।

মাওলানা তোফেল আহমদ ঃ- পাকিস্তানে যদি জামাতের দর্শন অনুযায়ী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আমি পাকিস্তানের খৃষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিমদের এ ব্যাপারে কোন অধিকার প্রদান করব না।

মাওলানা আবদুল হামেদ বাদাউনী ঃ- আমি নীতিগতভাবে সমর্থন করি যে, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, 'প্রত্যেক জাতি হতে দেশের শান্তি-শৃংখলা ও আইন প্রণয়নে জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব হওয়া উচিত। কিন্তু সৈন্য দলে এবং বিচার বিভাগে তাদের কোন পদ থাকবে না। কোন মন্ত্রী অথবা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যাবে না'।

যখন প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের অমুসলিমগণ যিম্মী নন এজন্যে যে পাকিস্তানকে কেউ জয় করে নাই। ইসলামী দেশে যে অমুসলিম থাকে তাকে 'মুআহেদ' (চুক্তিবদ্ধ নাগরিক) বলা হয়। যেহেতু তাদের সাথে কোন চুক্তি হয় নাই তাই এরা (অমুসলিমগণ) নাগরিকত্বের কোন সুযোগ সুবিধা পাবে না।' অর্থাৎ পাকিস্তানের আলেমদের মতে অমুসলিমগণ দেশের নাগরিকও হবে না যিম্মীও হবে না। তারা অমুসলিম 'মুআহেদ' হবে।

উপরোক্ত আদালতটি নিজের রিপোর্টে লিখেন যে, 'আলেমগণ এই ব্যাপারে একমত যে পাকিস্তানে যদি ইসলামী বিধি অনুযায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তা গণতান্ত্রিক হবে না। রিপোর্টে আরও লেখা আছে যে, 'বস্তুতঃ ইসলামী সরকার পরিচালিত দেশে সংবিধান এক ধরনের ইজমা' হলেও জনসাধারণ তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কেননা ইসলামী ফিকাহতে ইজমা' কেবলমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত আলেম ও মুজাতাহেদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। গণতন্ত্রের মত এই অধিকার জনসাধারণের নেই।

অতএব আমরা যদি এই সকল মৌলবাদের কল্পিত দর্শনের পিছনে চলতে থাকি তাহলে অমুসলিমগণ নিজের অধিকার মতে তো বঞ্চিত হবেই বরং জনসাধারণও আইন প্রণয়নে অংশীদার হতে পারবে না। বরং কেবলমাত্র ঐ সকল আলেমদের আধিপত্য হবে যারা নিজেরাই দীনের আলেম হবার দাবীদার। এও মনে রাখবেন যে আপনারা ভবিষ্যতে সংসদেও নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পারবেন না। কেননা পরবর্তীকালে এই দাবি উঠবে যে, সাংসদ হবার জন্যে 'আলেমে দীন', 'মুজতাহিদ' ও 'সালেহ' হতে হবে।

মনে রাখবেন, ঐ সকল লোক যারা পাকিস্তানের উদাহরণ দিয়ে আমাদের সংসদকে ধর্মে হস্তক্ষেপ করার পরামর্শ দিচ্ছে তারা আমাদেরকে পাকিস্তানের পরিণামের দিকে নিতে যাচ্ছে যেখান হতে শান্তি উঠে গেছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য তা নয়। এই বাংলাদেশে দেড় কোটি হিন্দু খৃষ্টানের বসবাস। তারা আমাদের মতই এদেশের নাগরিক। একথাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশি কোটি হিন্দুর মধ্যে দশ কোটি মুসলমান বসবাস করছে।

আমাদের সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। মৌলবাদীগণ আমাদের গণতন্ত্রের ভিতকে উপড়ে ফেলতে চায়। আমাদের দেশে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আছে। আমাদের সংবিধান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে সমভাবে এ অধিকার প্রদান করেছে। ইহা কারও অধিকার খর্ব না করার জামানত প্রদান করে। মৌলবাদের লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে অনড় স্তম্ভরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৌলবাদ হতে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

❑দৈনিক সংবাদ, ৩ জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখের সৌজন্যে

অভিমত

দেশে দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ বাধানোর প্রচেষ্টাকারী ঘাতক জামাত-শিবির চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

শাহরিয়ার কবীর

গত বছর জানুয়ারী মাসে একাত্তুরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে যখন আমরা গণআদালতে একাত্তুরের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক ও প্ররোচক সংবিধান লংঘনকারী গোলা আযমের বিচার এবং ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের দল জামাতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলাম, তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দেশের সর্বস্তরের জনগণ আমাদের কর্মসূচীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধী ঘাতকদের বিচারের দাবিতে সারা দেশে অত্যন্ত অল্প সময়ে ব্যাপক জনমত ও আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার প্রমাণ ২৬ মার্চ গণআদালতে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ এবং আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচীসমূহের উপর্যুপরি সাফল্য। আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ দাবি তুলেছেন গোলাম আযমসহ একাত্তুরের সকল যুদ্ধাপরাধী ও মানবতার শত্রুদের বিচার এবং ঘাতকদের সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ করার জন্যে। স্বাধীনতার চিহ্নিত-শত্রু জামাত-শিবির চক্রের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের ব্যাপকতার ভয়ে দিশেহারা হয়ে জামাতী নেতারা শুধু আবোল-তাবোল প্রলাপই বকছেন না, সেই সংগে এমন সব সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটাচ্ছেন যা আমাদের সদ্যলব্ধ গণতন্ত্রকেই শুধু পর্যুদস্ত করছে না, গোটা দেশকেই ঠেলে দিতে চাইছে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে।

একাত্তুরের ঘাতকদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী চক্রান্ত এবং অন্য সকল দুষ্কর্ম থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্যে জামাতীরা প্রথমে বলেছে আমাদের এই আন্দোলন নাকি ভারতের ষড়যন্ত্র এবং আন্দোলনের নেতারা নাকি ভারতের দালাল। তারা এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের পত্রিকায় আমাদের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে, এবং হত্যার নীলনক্শা প্রণয়ন করে সেই মত কাজও আরম্ভ করেছে। এরপর তারা অতি কুৎসিত ও জঘন্য ভাষায় নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তির দ্বারা আমাদের নেতৃবৃন্দের চরিত্র হননে লিপ্ত হয়েছে। তারা নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক জাহানারা ইমাম সম্পর্কে বলেছে, তাঁর নাকি একাত্তুরে পাকিস্তানী জেনারেলদের সাথে যোগাযোগ ছিলো,

যিনি কিনা একাত্তুরে নিজের ও গোটা পরিবারের জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন এবং নিজের সন্তান ও স্বামী হারিয়েছেন। নির্মূল কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরউজ্জামান সম্পর্কে এই কুৎসা রটনাকারী নাফরমানরা বলেছে, তিনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের পর রক্ষীবাহিনীর প্রধান হিসেবে ২৫ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছেন। অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে রক্ষীবাহিনীর প্রধান হওয়া দূরে থাক তিনি মুক্তিযুদ্ধের পর কখনোই কোনরকম সরকারি পদ গ্রহণ করেননি। এই মিথ্যাবাদীরা গণআদালতের অন্যতম বিচারক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক আহমদ শরীফের দু'টি ভাষণ বিকৃতভাবে প্রচার করে তাঁদের 'মুরতাদ' ঘোষণা করে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। আমাদের জনসভায় হামলা করে নির্মূল কমিটির কর্মী সন্দেহ করে নিজেদের লোক হত্যা করে আমাদের নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। ভারতের পুশব্যাকের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের এককোটি মানুষকে দেশছাড়া করার হুমকি দিয়েছে, বাবরি মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি এবং দাঙ্গার উস্কানি দিচ্ছে।

একই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাদের পরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে কাদিয়ানী মুসলমানদের উপর। নভেম্বর মাসে তারা ঢাকার বকশিবাজারে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কমপ্লেক্স-এ হামলা চালিয়ে কুরআন শরীফসহ অসংখ্য দুর্লভ ধর্মীয় গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত করেছে যার ভেতর ৫৪টি বিদেশী ভাষা অনূদিত পবিত্র কুরআন ছিলো। গত ২৭শে নভেম্বর কয়েক হাজার সশস্ত্র জামাতী রাজশাহীতে আহমদিয়া মুসলিম জামাত কমপ্লেক্স-এ অনুরূপ হামলা চালিয়ে তাদের নির্মীয়মান মসজিদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেছে। ১৯৫৩ সালে তারা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে দাঙ্গা বাঁধিয়ে কয়েক হাজার কাদিয়ানী হত্যা করেছে যাদের হাত থেকে নিষ্পাপ শিশুরাও রেহাই পায়নি, যেমনটি তারা করেছে একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে। '৫৩ সালে এই দাঙ্গা ঘটানোর জন্যে পাঞ্জাবের বিশেষ সামরিক আদালতের রায়ে জামাতীদের প্রধান নেতা মওদুদীর ফাঁসির হুকুম হয়েছিলো, পরে সরকারের অনুকম্পা লাভ করে এই সাজা ১৪ বছরের কারাদন্ডে রূপান্তরিত হয়।

জামাতীদের এইসব নৃশংস কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকারের বিস্ময়কর নীরবতাকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা পরোক্ষ প্ররোচণা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ জামাতীদের মত সরকারও বিরোধী দলের আন্দোলন দমনের জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করছে। জামাতীদের পাশাপাশি আমরা সরকারকে

স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, দেশে যে কোন পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার যে কোন প্রয়াসকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর সরাসরি হামলা হিসেবে বিবেচনা করবো এবং যে কোন মূল্যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপমহাদেশের প্রধান ইসলাম প্রচার কেন্দ্র দেওবন্দ মাদ্রাসার খ্যাতনামা আলেমরা এবং উপমহাদেশের বিশিষ্ট পীর মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদরা জামাতীদের সম্পর্কে বলেছেন, তারা কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, পয়গম্বর নবী রসূল এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরূপ সমালোচনা করে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। তাঁরা এমনও ফতোয়া দিয়েছেন – কোন ঈমানদার মুসলমান যেন জামাতী মুরতাদদের সঙ্গে কোন সংশ্রব না রাখেন। কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত পথভ্রষ্ট জামাতীরা যখন কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি করে কিংবা ডঃ আহমদ শরীফ ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে ভারতের দালাল আখ্যায়িত করে হত্যার হুমকি দেয় এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে '৫৩ সালের ভয়াবহ কাদিয়ানী দাঙ্গা এবং '৭১-এর নৃশংস গণহত্যার নির্মম দৃশ্যাবলী যার জন্যে গোটা বাঙালি জামাতীদের ঘৃণা করবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

জামাতীদের এসকল সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে সরকারের নীরবতা এবং প্রশ্রয় তাদের সদ্য ঘোষিত 'সন্ত্রাস দমন আইন'-এর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিরোধী দলসমূহের বক্তব্যের সারবত্তাই প্রমাণ করে। এই অধ্যাদেশ জারির পরই নিরীহ কাদিয়ানীদের উপর জামাতীরা হামলা করেছে, হামলাকারীদের সম্পর্কে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে অথচ অতীতের অন্য সব ঘটনার মত এবারও জামাতীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। সরকারকে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেই চাই, দেশের আইন সকলের জন্য সমান। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের প্রচেষ্টাকারী কিংবা ইসলাম রক্ষার দোহাই দিয়ে গোলযোগ সৃষ্টিকারী চিহ্নিত ঘাতকদের বিরুদ্ধে যদি পূর্বাহ্নে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে সরকারকেই পুরোপুরি দায়ী হতে হবে।

❑ (দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে ঃ ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯৩ এর সংখ্যা)

বন্ধ হোক এই কানামাছি খেলা

ইসহাক খান

পৃথিবীর সর্বত্রই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতনের শিকার। কোথাও রাজনৈতিক কারণে, কোথাও বর্ণবাদ, কোথাও ধর্মীয় উগ্রবাদ, আবার কোথাও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের জের হিসেবে সংখ্যালঘুদের উপর চলছে অমানুষিক, এক কথায় পাশবিক অত্যাচার। সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার এই যুগে তুচ্ছ জাতিগত, গোষ্ঠীগত এবং ধর্ম নিয়ে মানুষের অযথা বাড়াবাড়ি, ভাবলে নিজের মনুষ্য পরিচয় নিজের কাছে আড়ষ্ট হয়ে আসে। দেখে শুনে মনে হয়, মানুষ বুঝি আবার প্রস্তর যুগে ফিরে গেছে। যেখানে মানবিক মূল্যবোধের হিসেব নিকেশ ছিল না, ভালবাসা-বিশ্বাস কোনটারই ধার ধারতো না মানুষ, নিজের ক্ষমতাকে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করতে অন্যকে নিগ্রহ করতো নির্দয়ভাবে, তাতে বাদ প্রতিবাদ করতো না কেউ। কিন্তু সভ্য দুনিয়াতে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তা কি কারও কাম্য হতে পারে?

অথচ সেই অনাকাংক্ষিত ঘটনাগুলো সভ্যতার পশ্চাতে পদাঘাত করে ঘটে চলেছে একের পর এক। পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত-সেখানে আজ ধর্মের নামে আদিম হিংস্রতায় সংখ্যালঘুদের জানমাল হচ্ছে বিপর্যস্ত, হত্যা-লুণ্ঠন বিশ্ববিবেককে করেছে পদদলিত। এবং তারই জের হিসেবে প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেও চলছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহ তান্ডব।

এতো গেল তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের অভাবী মানুষদের কেচ্ছা। যাদের মূল্যবোধ এখনও আদিমযুগের কাছাকাছি। যারা সহসাই উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে সস্তা কোনো শ্লোগানে কিংবা বিক্রি হয়ে যেতে পারে ক্ষুধার কাছে। তাদের ব্যাপারটা না হয় হেলাফেলা চোখে দেখা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা যদি ঘটে উন্নত দুনিয়ার সভ্য মানুষদের মধ্যে তাহলে ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে আমরা বসনিয়ার সংখ্যালঘু মুসলমানদের কথ উল্লেখ করতে পারি। সেখানে কি হচ্ছে? যা হচ্ছে তা কি এক কথায় বলে বোঝানো সম্ভব? সভ্যতার উন্নত শিখরে অধিষ্ঠিত বলে দাবীদার, যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে; উন্নততর মানুষ বলে পরিচিত-সেই সভ্য ইউরোপের সভ্য মানুষেরা বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ ধর্মীয় বিভেদ তুলে ফিরে গেছে বর্বরতার যুগে। তারা নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে।

সম্প্রতি ভোরের কাগজ-এ রাজনীতিবিদ অজয় রায় সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে একটি লেখা লিখেছেন। তার লেখাটি মূলতঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে, সেটাও শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের সমস্যা। এই বাংলাদেশে অন্য ধর্মাবলম্বী ছাড়াও কেবলমাত্র ইসলাম সমর্থকদের মধ্যেই তিনটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে - শিয়া, আহমদিয়া ও লা-মজহাব জামাত। তাদের সমস্যা নিয়ে অজয়দা কিছু বলেন নি। অবশ্য তার বিষয়টি ভিন্ন। তিনি লিখেছেন সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ জটিল পরিস্থিতি নিয়ে। সেখানে তিনি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যা, তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের দেশে ত্যাগের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন। পরিশেষে, এবারকার ঘটনার পর সংখ্যালঘু সমস্যাটিকে পাশ না কাটিয়ে যেতে বলেছেন, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার অর্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই দুর্বল করা।'

অজয় রায়ের সতর্ক বাণী উচ্চারণ খুবই যথার্থ। যে দেশের সংখ্যালঘুরা নিজের জন্মভূমিকে নিজের দেশ হিসেবে ভাবতে দ্বিধান্বিত, সে দেশের সার্বিক কল্যাণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। শুধু কি তাই, একজন সংখ্যালঘু কিশোর যখন ভাবতে থাকে যে, সে এদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, স্বভাবতঃই তার ভেতরে নিজস্ব সত্তা ক্রমশঃ স্তিমিত হতে থাকে, সে নিজেকে অবাঞ্ছিত ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। একজন নাগরিক হিসেবে তার এই মানসিক যন্ত্রণা কতটা ভয়াবহ তা কেবল একজন সংখ্যালঘুই অনুভব করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রতিষ্ঠিত কবির বেদনামিশ্রিত অনুভূতির কথা উল্লেখ করা যায়। দাঙ্গার পরে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দাদা, কেমন আছেন? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' জবাবে ম্লান হেসে বলেছেন, 'না, অসুবিধে হয়নি। ঘটনার পর অনেকেই খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তবে এত মানুষের খোঁজ-খবর নেয়াতে নিজের কাছে কেবলই প্রশ্ন জেগেছে, আমি কে, এখানে আমার পরিচয় কি, আমি কি নিজ দেশে অন্যের করুণা আর সহানুভূতি নিয়ে বাঁচবো?'

এ কথার আমি জবাব খুঁজে পাইনি। দেবার মতো জবাবও নেই। সংখ্যালঘুদের যে সমস্যা সেটা সংখ্যাগুরুদের অনুভব করা কঠিন। যদি সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের সমস্যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারতো তাহলে দাঙ্গার মতো দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না। কিন্তু সংখ্যাগুরুরা চিরকালই নিজেদের সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। যার পরিণতি পৃথিবীর সবদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর জঘন্য নির্যাতন। অথচ ব্যাপারটি সবারই খোলা মনে ভাবা দরকার। যারা বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু তারাই কিন্তু অন্যদেশে

সংখ্যালঘু। অজয় রায় শুধু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়টিকে সামনে তুলে ধরছেন, তাও আবার শুধু হিন্দু ধর্মবলম্বীদের সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যাতো সারা পৃথিবীব্যাপী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা, ভুটান, শ্রীলংকা এবং গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতেও। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকেই গত কয়েক বছর হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রফতানি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। যার ঢেউ এসে পড়েছে বাংলাদেশেও। তাই বলে বাংলাদেশের মানুষ, যে নিখাদ তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এখানেও হিংস্র নখর দাঁতঅলারা ওঁৎ পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। যার দুঃখজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটেচে উগ্রবাদীদের দ্বারা আহমদিয়া জামাতের মসজিদ ধ্বংস।

এইতো ক'দিন আগে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা ঢাকার বকশী বাজার এবং রাজশাহীর আহমদিয়া জামাতের মসজিদ এবং মসজিদে রক্ষিত ধর্মীয় গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে আহমদিয়ারা সংখ্যালঘু বলে। যদি তারা এদেশে সংখ্যাগুরু হতো তাহলে হয়তো ব্যাপারটা উল্টো ঘটতো। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, বছর দুই আগে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগুরু হানাফিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা সিরাজগঞ্জ জেলা বেলকুচি থানার সাতলাটি গ্রামের সংখ্যালঘু লা-মজহাব সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসে। তারা লোকজনকে জখম করে, বাড়িঘর লুট করে এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটায়। যদিও তারা উভয়ই মুসলমান। শুধুমাত্র লা-মজহাব সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বলে তাদের উপর চালায় বর্বরোচিত আক্রমণ। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে, সংখ্যালঘুরা কোথাও নিরাপদ নয়, তা সে অশিক্ষিত গরীব দেশ হোক বা উন্নত প্রযুক্তির ধনীর দেশ হোক। সর্বত্রই সংখ্যালঘুরা অবাঞ্ছিত!

আমরা এই অমানবিক বৈষম্যের অবসান চাই। আমরা চাই একজন মানুষ, তা সে যে ধর্মেরই হোক, যে বর্ণেরই হোক, যে ভাষারই হোক তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ। আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তার জন্মগত এবং নাগরিক অধিকার। তার নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এবং সেটা করবে রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করছে, তারা। অজয় দা, আপনি বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবার জন্য গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান করেছেন। তাতে কি খুব ভাল হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্র শাসনযন্ত্র ও প্রচারযন্ত্র যৌথভাবে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা না চালাবে, শুধুমাত্র জনমত আর গণতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা রোখা সম্ভব কি না এটি এখন সর্বাগ্রে ভাবা দরকার।

সংখ্যালঘু দুর্বলরা কার কাছে বেঁচে থাকার আকুতি জানাবে; রক্ষকই যেখানে ভক্ষক। সেখানে দুর্বলের আর্তনাদ কখনও কখনও রাজনৈতিক নেতাদের মনে করুণার উদ্রেক করে বটে – তা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, বাস্তবে ঘটে তার উল্টোটি। এমন ধারা শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রের চালকরা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হবে।

❑ ইসহাক খান ঃ গল্পকার ও কলাম লেখক।

প্রকাশিত গ্রন্থ-নগ্ন নাটমন্দির, স্বপ্নের সুন্দর।

(সৌজন্যে ভোরের কাগজ ঃ ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯৩)

মওদুদী থেকে গোলাম আযম

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

আমাদের ধর্ম ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে একত্ববাদ (তৌহিদ)। আমাদের এক আল্লাহ, এক রসূল, এক কেতাব (কোরআন), এক কাবা এবং বলা হয় উম্মা হিসেবেও আমরা এক। কিন্তু ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, আত্মঘাতী বিরোধ, রক্তপাত এবং অনৈক্য ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে পুরো একটি শতাব্দীরও শান্তি ও ঐক্যের নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম যুগের চার খলিফার মধ্যে তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের মধ্যে বিরোধে যে নৃশংসতার রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার তুলনা সে যুগেও বিরল। এ যুগেও দেখা যাচ্ছে মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য নেই। একই দেশের মুসলিম উম্মার মধ্যেও শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি নেই। এজন্য গালফ্ যুদ্ধ, পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী বিরোধ বা বাংলাদেশে জামাতে ইসলামী ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে রক্তারক্তির দিকে তাকাবার দরকার নেই। এই লন্ডন শহরে বাঙ্গালী মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনেও আমরা একইদিনে রোজার ঈদের উৎসব পালন করতে পারিনি। এ বছরেও একদল করেছেন শুক্রবার (৩ এপ্রিল), আরেকদল করেছেন শনিবার (৪ এপ্রিল)। ঈদ উৎসব পালন নিয়ে এই ধরনের অনৈক্য ও সংঘাতও চলছে বছরের পর বছর ধরে। আমার প্রশ্ন, বছরের এই একটি দিনেও একটি দেশের একই শহরে আমরা এক হয়ে ঈদের উৎসব যদি পালন করতে না পারি; তাহলে ইসলামের নামে শান্তি ও ঐক্যের বড় বড় বুলি আওড়িয়ে লাভ কি?

কারবালার যুদ্ধ মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে হয়নি। হয়েছিল দু'দল মুসলমানের মধ্যে। রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) এক সাহাবার ছেলে এজিদই ধ্বংস করেছে নবী বংশ। কোন খৃষ্টান ইহুদীদের দ্বারা এই কাজটি হয়নি। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে যিনি সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মহিশূরের সেই টিপু সুলতানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন হায়দ্রাবাদের মুসলমান শাসক নিজাম। বাংলাদেশে বৃটিশবিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় ঢাকার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দূল গনির বিশ্বাসঘাতকতায়। তার দেওয়া গোপন খবরের ভিত্তিতে

ঢাকার তৎকালীন আন্টাঘরের ময়দানে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) হাজার হাজার সিপাহীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে হত্যা করা হয়।

বর্তমান যুগেও মুসলমান দেশগুলোর দুঃখ-দুর্দশার বড় কারণ আত্মঘাতী বিরোধ ও অনৈক্য। গাল্‌ফ যুদ্ধের এতবড় নৃশংসতা থেকেও সউদী আরবসহ প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাজাদের কোন শিক্ষা হয়নি। তারা এখনও ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও লিবিয়ার গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মদত ও সাহায্য যুগিয়ে চলেছে, তাদের পদলেহন করছে। ফলে শক্তি, ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য বাড়ছে ইসরায়েলের। পাকিস্তানে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি দ্বারা এই বিরোধ তৈরী করেন জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা মওদুদী। সে সময় পাকিস্তানে কাদিয়ানীবিরোধী দাঙ্গায় ৫০ হাজার মুসলমান নিহত হয়। দাঙ্গা এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে, সেনাবাহিনীকে মসজিদে ঢুকে গুলি চালাতে হয়েছিল। এই দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, কাদিয়ানীবিরোধী ইশ্‌তাহারগুলো জামাত সউদী আরবের অর্থে প্রকাশ করে; এমন কি এই প্রচারকার্যে করাচীস্থ আমেরিকার দূতাবাসেরও যোগসাজশ ছিল। বর্তমানে যেমন বাংলাদেশে জামাত নেতা গোলাম আযমের বিরুদ্ধে '৭১ সালের গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে ফাঁসির দাবি উঠেছিল। বাংলাদেশের বর্তমান বিএনপি সরকারের সঙ্গে তৎকালীন পাকিস্তানের আইয়ুব সরকারের পার্থক্য এই যে, আইয়ুব সরকর সেকালে এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন এবং মওলানা মওদুদী ও তার সাগরেদদের বিচারে সোপর্দ করেছিলেন। বিচারপতি মনির এই বিচার শেষে তার নাতিদীর্ঘ রায়ে মওলানা মওদুদীকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। এই ফাঁসির আদেশ রদ করার জন্য তৎকালীন জামাতে ইসলামীর আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং মওলানা মওদুদী প্রেসিডেন্ট আইউয়ুবের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান। সেই পঞ্চাশের দশকেও সউদী আরব ও আমেরিকার চাপে প্রেসিডেন্ট আউয়ুব মওলানা মওদুদীর প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করেন। পাকিস্তানে পঞ্চাশের দশকের এই কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলনই গড়াতে গড়াতে আশির দশকে এসে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার মধ্যে পরিণতি লাভ করে। সংখ্যালঘু কাদিয়ানীদের উপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। কাদিয়ানীদের পর এখন পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী বিরোধও শুরু হয়েছে। শুনেছি, বাংলাদেশেও নাকি কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চলছে। এর পেছনেও জামাতে ইসলামীর হাত থাকলে আমি বিস্মিত হবো না। সাম্প্রতিককালে কোন কোন মুসলিম দেশে শিয়া-সুন্নী বিরোধ নতুন ব্যাপ্তি লাভ করেছে ইরানের ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল

রাজারা বিশেষ করে সউদী আরবের রাজ পরিবার এই বিপ্লবকে ভয়ের চোখে দেখেন। তাদের আশংকা, একদিন সউদী আরবেও প্রকৃত ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবে এবং মধ্যযুগীয় অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটবে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং দেশে দেশে শিয়া-সুন্নী বিরোধ উস্কে দিয়ে সউদী রাজারা ইসলামী বিপ্লবে অনৈক্য সৃষ্টি এবং তাকে বিপর্যস্ত করতে চান। ইসলামী শক্তির পুনর্জাগরণে ভীত পশ্চিমা খৃষ্টান শক্তি এবং ইসরায়েলও তাই সউদী রাজাদের এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারতো স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, সমাজতন্ত্রের সুপার পাওয়ারের পতন ঘটেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তি ও স্বার্থের জন্য এক নতুন হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকার এক প্রভাবশালী নেতা আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব মুসলিম অঙ্গরাজ্যের হাতে আণবিক অস্ত্র আছে, তাদের সঙ্গে ইরান, ইরাক লিবিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান মিলে এক শক্তিশালী ইসলামী সুপার পাওয়ারের আবির্ভাব হতে পারে। পশ্চিমা শক্তিগুলোর উচিত এই সম্ভাবনা এখনই ঠেকানো। অনেকের ধারণা বর্তমানে বিভিন্ন অছিলায় ইরাকের সাদ্দাম হোসেন এবং লিবিয়ার গাদ্দাফীকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা যে নগ্ন সামরিক হামলার হুমকি দিচ্ছে, তা ভবিষ্যতের ইসলামী সুপার পাওয়ারের অভ্যুদয় ঠেকানোরই প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। আর বিশ্ব শক্তি হিসেবে ইসলামের এই পুনর্জাগরণের গতি বোধ করার জন্য ইহুদী খৃষ্টান শক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের প্রধান সহযোগী ও অনুচর হচ্ছে সউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজারা। এজন্যই ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ, প্যালেষ্টাইনের মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করা, পবিত্র কাবা ঘরে সউদী আরবের রাজতন্ত্রের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কয়েকজন হাজী শ্লোগান দেওয়ায় কাবা ঘরেই পুলিশ পাঠিয়ে ইরানী হাজীকে হত্যা করা এবং অতি সম্প্রতি কোরআনের একটি আয়াত সউদী আরবের বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার নিষিদ্ধ করা, রাজতন্ত্রের ইসলামবিরোধী ও গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় অসংখ্য সউদী আলেমের উপর নির্যাতন শুরু করা, অন্যদিকে বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় শ'য়ে শ'য়ে ক্যাসিনো, নাইট ক্লাব, পাব ও হোটেল কেনায় কোটি কোটি ডলার লগ্নি করা - ইত্যাদি কাজে সউদী আরবের প্লেবয় রাজা ও অন্যান্য শেখতন্ত্র ও আমীরতন্ত্রের কোন লজ্জা নেই।

শোনা যায়, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির মূলেও রয়েছে সউদী আরবের হাত। বার্মার একদল মুসলমানকে স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্য স্থাপনের

নামে অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা উস্কানী দিয়ে এই সমস্যাটি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানেরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু বার্মার ফৌজি সরকারকে নির্যাতন চালানোর একটি অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। এখন বার্মার সৈন্য বাহিনীর নির্যাতনে নিরীহ বর্মী মুসলমান নারী পুরুষ দলে দলে বাংলাদেশে পালিয়ে আসছে এবং এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র আটছে কোন কোন বিদেশী শক্তি। ঢাকার কাগজেও বার্মা-বাংলাদেশ সীমান্তে সউদী রাষ্ট্রদূত ও গোলাম আযমের বৈঠকের খবর পড়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেছি বাংলাদেশের বিএনপি সরকার তাদের নাকের ডগায় এসব কান্ড ঘটতে দিচ্ছেন কিভাবে ? সম্প্রতি লন্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার পাঁচ কলাম হেডিং-এ ছেপেছেন একটি গুরুতর খবর। ইন্ডিপেন্ডেন্টের খবরে বলা হয়েছে রোহিঙ্গার শরণার্থীদের মাধ্যমে বার্মা হয়ে চট্টগ্রামে জামাতীদের হাতে সউদী অস্ত্র আসছে। এই খবরের চাইতেও ইন্ডিপেন্ডেন্টের যে খবরটি আরও শংকাজনক তা হলো সউদী আরবের রাজারা প্রকাশ্যেই সরাসরি বাংলাদেশের জামাতে ইসলামী নেতাদের অঢেল অর্থ পাঠাচ্ছেন। এই সাহায্যদান চলছে বছরে পর বছর ধরে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের সরকার, সউদী আরবের কাছে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, একটি স্বাধীন দেশে অন্য দেশের সরকার সরাসরি কোন ব্যক্তি বা দলকে অর্থ পাঠাতে পারেন না। পাঠাতে হলে সরকারের মাধ্যমে পাঠাতে হয়। কিন্তু ঢাকার সউদী রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ সরকারের এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা দরকার মনে করেননি এবং এখনও করছেন না। আমি জানি না, লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্টের এই খবরটি সম্পর্কে বাংলাদেশের বর্তমান খালেদা জিয়ার সরকারের কোন ব্যাখ্যা। বক্তব্য রয়েছে কি না ?

সন্দেহ নেই গোলাম আযম মওলানা মওদুদীর যোগ্য শিষ্য। পাকিস্তানে মওদুদী-জামাত কাদিয়ানী হত্যা থেকে শুরু করে আফগান সমস্যা পর্যন্ত যে হত্যা, সন্ত্রাস, রক্তগঙ্গা বহানোর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বাংলাদেশে '৭১-এর বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যা থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গনে শিবিরের সন্ত্রাসী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, রোহিঙ্গা সমস্যা পর্যন্ত সেই একই ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামাত। পার্থক্য এই যে, পাকিস্তানে সরকারী উচ্চ আদালতে মওলানা মওদুদীর বিচার হয়েছিল এবং তার ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। বাংলাদেশে জামাতের আশ্রিত বিএনপি সরকার সেই বিচারকার্যে এগিয়ে যেতে সাহসী নন, এমন কি রাজিও নন। (ফরেনার্স এ্যাক্ট ভঙ্গ করার হাস্যকর অপরাধে গোলাম আযমকে জেলে নেওয়ার নামে প্রোটেকটিভ কাস্টোডিতে নিয়ে গণরোষ থেকে রক্ষা করা হয়েছে।) তাই বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের

গণআদালত গঠন করতে হয়েছে। গোলাম আযম এই দন্ড হয়তো এড়াবেন। কিন্তু বিচার যে এড়াতে পারলেন না, সাময়িকভাবে হলেও বর্তমান কারাদন্ডই তার প্রমাণ। এখানেই গণআদালতের রায়ের বিজয়। ইতিহাসের এবং মহাকালের চূড়ান্ত বিচারও গোলাম আযম এবং তার দল এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না। ইসলামের নামেতো নয়ই। কারণ সউদী আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়ালশীল রাজাদের অর্থে তাদের স্বার্থ রক্ষাই যে জামাতের প্রধান ভূমিকা, তা ক্রমশঃই জনসাধারণের চোখে ধরা পড়ছে। ইসলামের শান্তি, সাম্য, মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা নয়, সউদী আরবের রাজাদের অর্থে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেশে দেশে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও হানাহানি সৃষ্টিই জামাতের লক্ষ্য, তাও আজ গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু মুসলমান উম্মাকে বিভ্রান্ত করার জন্য জামাত মুখে ইসলামের বুলি ব্যবহার করছে। প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না চালিয়ে কেবল মস্কো ও পিকিং-এর তাবেদারী করতে গিয়ে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি যেমন নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তেমনি প্রকৃত ইসলামী অনুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আন্দোলনে ব্রতী না হয়ে সউদী আরবের রাজাদের অর্থে তাদের স্বার্থ ও গদী রক্ষার জন্য ইসলামের নাম ভাঙিয়ে জামাতে ইসলামীর এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসও চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থ, প্রত্যাখ্যাত ও পরাজিত হতে বাধ্য। সউদী আরবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের পতনের দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। দুশ্চরিত্র ও ইসলামবিরোধী সউদী পরিবার জজিরাতুল আরবের পবিত্র ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও জামাতী দুঃস্বপ্নের চিরসমাপ্তি ঘটবে।

বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি বা দল যদি প্রকৃত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চান এবং সেজন্য বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে জনগণের সামনে এগিয়ে যান, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবও দরকার হতে পারে। কিন্তু বিপ্লব ও সন্ত্রাস এক কথা নয়। উপর থেকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন ব্যবস্থাই স্থায়ী হয় না। সমাজতন্ত্র যত ভালো আদর্শ ও ব্যবস্থা হোক, পূর্ব ইউরোপে তা বন্দুকের জোরে চাপিয়ে দিয়ে স্থায়ী করা যায়নি। জামাতে ইসলামীর ভেতরের অনেক দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রেমিক নেতা ও কর্মী এই সত্যটি অনুধাবন করে গোলাম আযমের জামাত থেকে দূরে সরে গেছেন। পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, লা ইকরাহা ফিদ্দীন-ধর্মে কোন জুলুম নেই। কোরআনের এই নির্দেশ থেকেই বুঝা যায়,ধর্মীয় সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতেও জুলুম অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়া চলে না। রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তার সাহাবারা কখনো আত্মরক্ষার চূড়ান্ত তাগিদ ছাড়া ইসলাম প্রচারের জন্য অস্ত্রধারণ করেননি। গোলাম আযম ও তার দল বাংলাদেশে কিবাবে

জুলুম ও সন্ত্রাসের সাহায্যে তথাকথিত ইসলামী ব্যবস্থাকে কায়েম করবেন, তা আমি জানি না। তাদের হাত থেকে এখনও '৭১ –এর গণহত্যার রক্তের দাগ শুকোয়নি ('৭১–এ যে বুদ্ধিজীবীদের তারা হত্যা করেছেন, তাদের অধিকাংশ মুসলমান)। এখন আবার তারা বাংলাদেশে রক্তপাত শুরু করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বদলে অনৈক্য সৃষ্টি করে, এক মুসলমানের রক্তে অন্য মুসলমানের হাত রাঙিয়ে গোলাম আযমের দল বাংলাদেশে কি ধরনের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চান, আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝি, এটা আল্লাহ্‌র মনোনীত শান্তির ধর্ম ইসলাম নয়; এটা ধর্ম নয়, ধর্ম ব্যবসা। এটা শান্তি ও মানবতার আদর্শ নয়, অশান্তি ও সন্ত্রাসের পন্থা। প্রকৃত ইসলামে যারা বিশ্বাস করেন, গোলাম আযমের দলের মত ও পথ থেকে তাদের সর্বতোভাবে সতর্ক ও সাবধান হওয়ার সময় এখন এসেছে।

❑ লন্ডন ৬ই এপ্রিল '৯২

দৈনিক বাংলার বাণীর সৌজন্যে, তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৯৯২

আজকের জিজ্ঞাসা

স্বপন চৌধুরী

আজ ১৬ই ডিসেম্বর গৌরবময় বিজয় দিবস। আজকের এই দিন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও নতুন করে অঙ্গীকার করার দিন। আমাদিগকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, স্বাধীনতা লাভের পর আমরা কি পেয়েছি কি করেছি এবং কোথায় আমাদের ভুল হয়েছে। আমাদের লক্ষ্যে কতটুকু অগ্রসর হয়েছি। আমরা একটা মহান সংগ্রামের পর বহু জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় এই দীপ্ত চেতনায় ঘোষণা রয়েছে যে, আমরা বাংলাদেশের জনগণ, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা এই ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত হবে। আমাদের সংবিধানের ১১ নং ধারানুযায়ী আমরা জাতির সাথে এই অঙ্গীকারও করেছি যে, এই প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে।

আমরা অতীতের দিকে ফিরে চাইলে দেখতে পাই যে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বপ্ন হয়ত পূর্ণ হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের লক্ষ্যে পাঁয়তারা চলছে। আমরা একটি স্বাধীন সরকার তো প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু অতীতের অনেক দোষত্রুটি এবং বর্তমানের অনেক কুপ্রভাব হতে নিজদিগকে মুক্ত করতে পারিনি। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে এখনও আমরা নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করিনি। মনে হয় বিভিন্ন পর্যায়ে অতীতের দোষত্রুটির পুনরাবৃত্তি যেন করতে চাই। আমরা অত্যাচার, অন্যায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পাকিস্তান হতে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। কিন্তু এখন মনে হয় যেন পদে পদে পাকিস্তানের ভুল পদক্ষেপগুলির পুনরাবৃত্তিই করে যাচ্ছি। পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে সরিয়ে সামরিক শাসন আসে। আমরাও সামরিক শাসনের রাস্তায় চলেছি। স্বাধীনতার পরবর্তী স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে দু'দুবার সামরিক আইন জারি হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী জিয়াউল হক সুদীর্ঘ এগার বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের সর্বেসর্বা মালিক হয়েছিল। সে এই সুযোগ আফগানিস্তানের পরিস্থিতির কারণে পেয়েছিল কেননা এইরূপ হওয়াই কোন না

কোন পরাশক্তির স্বার্থে ছিল। আমাদের দেশে সামরিক সরকার এত সুযোগ পায়নি। পাকিস্তানে জিয়াউল হক নিজের অবৈধ সরকারকে স্থায়িত্ব দেবার লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার করেছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান গত ১৯৭৯ সালে যখন রাজনীতিতে ইসলামের প্রবর্তন করা শুরু করল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ব্যবসায়ীদিগকে নিজের করায়ত্ত করা যাতে করে তাদের সাহায্যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে পরাভূত করা যায়। মোল্লাদিগকে কল্পনাতীত গুরুত্ব দেয়া হয়। সরকারের ছত্রছায়ায় তারা বিস্তার লাভ করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজেদের থাবা গেড়ে দেয়। সেই জামাতে ইসলামী যারা দীর্ঘ দিন যাবত সরকারী ভবনের আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক স্বৈরাচারের সাথে আঁতাত করে ফেলে এবং সেই জামাতে ইসলামী যারা সর্বদা বেসামরিক ও সামরিক সরকারের সাথে বিরোধিতা করে আসছিল, হঠাৎ করেই সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে ফেলে। আমাদের এখানের অবস্থাও প্রায় একই। জিয়াউল হক আলেমদের ক্রয় করে নিজের জন্য ব্যবহার করেছে। অপরদিকে আমাদের দেশে গণভবনের মসজিদে আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী সরকারী পয়সায় লালিত হয়। পরবর্তীকালে তার উপর অসংখ্য অভিযোগ প্রকাশ পায়। পাকিস্তানে আলেমদের সরকারী গ্রেড দেয়া হয় এবং তারা সরকারী চাকুরিজীবীতে পরিণত হয় যেমন, লাহোরের শাহী মসজিদের খতিব ও অন্যান্য আলেমদের ১৯ গ্রেড দেয়া হয়। বাংলাদেশেও বায়তুল মোকার্‌রমের খতিবকে 'জাতীয় খতিব' বলে আখ্যা দেয়া হয়। জিয়াউল হক এগার বছর পর্যন্ত মোলাতন্ত্র ও মৌলবাদীদের প্রসারতা দান করে নিজের গদীকে মজবুত করতে থাকে। বাংলাদেশেও জেনারেল এরশাদ তারই পদাংক অনুসরণ করতে চেয়ে ছিল যার পরিণতিতে আমাদের দেশে মৌলবাদ বিস্তার লাভ করে। পাস্তিান হতে যখন সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় তখন সেখানে মৌলবাদ শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল। সামরিক প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রে মৌলবাদীদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ফলে জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর বেসামরিক রাজনীতিবিদগণও একই পন্থা অবলম্বন করে এবং সেখানকার লোক ইহাকে জিয়ার 'প্রেতাত্মা' বলে আখ্যায়িত করে। বর্তমানে পাকিস্তানে যে সরকার রয়েছে তাতেও জামাতে ইসলামী অংশীদার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে যখন গণতান্ত্রিক ধারায় বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেও জামাতে ইসলামী অংশীদার হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, জামাতে ইসলামী ও তাদের সঙ্গীরা গণতান্ত্রিক শক্তির বিরোধিতা করেছিল এবং ৭০-এর নির্বাচনে ভুট্টো এবং পিপলস পার্টিকে কাফের বলে সম্বোধন করত। সে সময় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক প্রশাসনের সাথে জামাতে ইসলামীর আঁতাত ছিল না কিন্তু এখানে (তৎকালীন

পূর্ব পাকিস্তানে)সামরিক সরকারের সাথে আঁতাত করে জনসাধারণের রক্ত দিয়ে হোলি খেলেছে, যে নৃশংস ও সীমাহীন অত্যাচার আল-শাম্‌স এবং আল বদর বাহিনী দ্বারা দেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ মানুষের ওপর করা হয়েছে তা মানবেতিহাসের একটি কলংকময় অধ্যায়। এই কারণেই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কোন ক্রমেই জামাতে ইসলামের সাথে সমঝোতা করার পক্ষপাতী নয়। তাই গণআদালত গোলাম আযমের ফাঁসী এবং জামাতে ইসলামীকে অবৈধ ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সেই জামাতে ইসলামীই বর্তমান সরকারের সহযোগী, এই সুযোগে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদের হীনমন্যতা বিস্তার লাভ করেছে। আমরা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান হতে স্বাধীনতা লাভ করেছি। তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্যতা কি কাকতালীয় ? না কোন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এই দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে গুটি চালছে। আজকের এই দিনে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে, সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গীকার আমাদের এই প্রিয় দেশে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গীকার আমাদের এই প্রিয় দেশে কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের সার্বভৌমত্বে কোথাও হস্তক্ষেপ করার প্রয়াশতো চালানো হচ্ছে না? দেখতে হবে কোন উপায়ে প্রভাব খাটিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্বকে পঙ্গু করছে না তো,অথবা অকার্যকর করে দিচ্ছে না তো। পাকিস্তানের মৌলভী অথবা মৌলবাদী চক্র ধর্মীয় অনুভূতির নামে এবং ধর্মের আড়ালে আমাদের সার্বভৌমত্বে ফাটল ধরাচ্ছে না তো।

কিছুদিন পূর্বে ঢাকা এয়ারপোর্টে কিছু বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয় যে, যে ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র এনেছিল সে পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর একজন সক্রিয় কর্মী। বলা হয় পাকিস্তানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জামাতে ইসলামী অস্ত্রের গুদামে পরিণত করেছে। তাই ভেবে দেখতে হবে জামাতে ইসলামী এই অস্ত্র আমাদের শান্তিপ্রিয় দেশে কেন আনছে ? এর পূর্বে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যখন জামাতে ইসলামীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল তখন বাংলার এই মাটিকে বাংলাদেশীদের রক্ত দ্বারা এই ভাবে রঞ্জিত করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মাটি হতে সেই রক্তের দাগ আজও মুছে যায়নি। আজও সেই দেশ বরেণ্য ও দেশপ্রেমিকদের রক্তের আর্তনাদ বাংলাদেশের আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমানে আবার জামাতে ইসলামী চোরাই পথে বাংলাদেশের মাটিতে কেন অস্ত্র জমা করছে ? এটা তো শুধু একটি সাধারণ ঘটনা যে, এক ব্যক্তি ধরা পড়েছে এবং কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিন্তু এমন আরও বহু ঘটনা দৃষ্টির অগোচরে

হয়ে চলেছে এটা তারই ইঙ্গিতবহ। প্রশ্ন উঠে পাকিস্তান হতে কেন অস্ত্রশস্ত্র আসছে। আমরা এটা ভুলে যাচ্ছি পাকিস্তান হতে যে শুধু অস্ত্র আসছে তাই নয় বরং সেখান হতে বক্তাদেরকে এনেও বাংলাদেশের মাটিতে আগুনকড়া বক্তৃতা দেয়ানো হচ্ছে। কখনও তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়তের নামে, কখনও ইসলাম সংকটে রয়েছে বলে এবং কখনও অন্য কোন ধুয়া তুলে। আজ আমাদিগকে এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। কেননা আজকের এই দিনটি আত্মজিজ্ঞাসার দিন। আমরাতো এই অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমাদের দেশটি সর্বতোভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হবে। অতি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, গণতন্ত্র এবং মোল্লাতন্ত্র অথবা মৌলবাদের মূল স্বভাব, চরিত্র ও কার্যপদ্ধতিতে এত ব্যবধান যে, কখনও এই দু'টি এক সঙ্গে চলতে পারে কি ? পারে না। মৌলবাদ যে নামেই হোক না কেন সেটা ইসলামেরই মৌলবাদ হোক, বি, জে, পি'রই মৌলবাদ হোক অথবা অথবা খৃষ্টানদের মৌলবাদই হোক সবাই গণতন্ত্রের শত্রু। মৌলবাদীরা নিজেরাও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমরা চতুর্দিকে তাকালে দেখি যে, মৌলবাদী দলগুলো কতভাবেই না সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করে রেখেছে! এক কথায় মৌলবাদ দ্বারা বিশৃংখলা ও সংঘর্ষ হওয়া অনিবার্য। ইহা ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্যের দ্বার প্রশস্তভাবে খুলে দেয়।

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হল অপরের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞান। গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অনুযায়ী বিষয়াবলীর সমাধান করে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে হয়। অপরদিকে মৌলবাদ জনগণের সামনে জবাবদিহির ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় এবং স্বৈরতন্ত্রকে লালন করে। তারা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বের উৎসকে নিজেদের স্বর্গীয় ক্ষমতার ভিত্তি মনে করে। অতএব এই দু'টি মতবাদ কখনও এক হয়ে চলতে পারে না। গণতন্ত্রকামীরা কখনও মৌলবাদীদের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। তেমনভাবে মৌলবাদীরাও গণতন্ত্রকামীদের সহ্য করতে পারে না। গণতন্ত্রের ভিত্তি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত; এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। মৌলবাদ দর্শনে তর্ক বিতর্ক ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরীর শামিল যার শাস্তি কঠোর। এমনকি হত্যা ও প্রকাশ্যে ফাঁসি। গণতান্ত্রিক পরিবেশে ইহা আশা করা যায় যে, একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান প্রদর্শন করবে। কিন্তু মৌলবাদীরা ভিন্ন দষ্টিভঙ্গিকে সহ্যই করতে পারে না। অতএব ভেবে দেখুন গণতন্ত্রের সাথে মৌলবাদের সম্পর্ক কিভাবে থাকতে পারে, যদি কখনও মৌলবাদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করে তখন তারা গণতন্ত্রের ভিতকে উপড়ে ফেলতে প্রয়াসী হয় এবং সুযোগ পেলে গণতন্ত্রকে হত্যা করে তার কবরের ওপরে নিজেদের

পতাকা উত্তোলন করে দেয়। মতবিরোধ ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে গণতন্ত্রের কোন মূল্য নেই, এই জন্যে আপনাকে হয় গণতন্ত্রকামী অথবা মৌলবাদী হতে হবে। একই সময়ে দুই নৌকায় উঠা যাবে না। মৌলবাদীরা ক্ষমতায় আসলে সর্বপ্রথম বিবেকের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতাবোধকে উপড়ে ফেলে এবং বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাকে দূরে ঠেলে দেয়। সভ্যজগৎ ও সভ্যসমাজে জাতিকে অস্পৃশ্যে পরিণত করে। সুতরাং দেশবাসীকে মীমাংসা করতে হবে তারা গণতন্ত্র চায়, না মৌলবাদ। এর মীমাংসা হওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময় এবং আজকের দিনকে সার্থক করতে হলে এই আত্মজিজ্ঞাসা এড়ানো যায় না।

পাকিস্তানে মৌলবাদীরা যে কর্মকান্ড করেছে তা আমাদের সামনে। পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও পত্র-পত্রিকা এটা অনুভব করতে শুরু করেছে যে, ধর্মান্ধতার কারণে সেখানে মানসিক বিপর্যয় শুরু হতে চলেছে এবং সরকারের ছত্রছায়ায় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মোল্লাতন্ত্রকে প্রসারতা দানে বিভক্তিকরণকে এত প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে যে, গোটা সমাজ তলে তলে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হচ্ছে। শিয়া-সুন্নীরা একে অপরের আলেমকে হত্যা করছে যার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মীয় গোঁড়ামীর দিকে জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং জাতি মোল্লাদের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে। অতএব উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে আজকের এই মহান দিবসে আমাদিগকে স্থির করতে হবে যে, সংকীর্ণ মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা কি আমাদের মহান সাংবিধানিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকারকে পিঠের পিছনে ফেলে দেব? না মৌলবাদের মূল উৎপাটন করে উদার গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে লালনের মাধ্যমে লাখো শহীদের রক্তের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করব।

❑ *সংবাদ ঃ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যার সৌজন্যে*

জামাতের আরেকটি নতুন অস্ত্র আবিষ্কার

আবদুস সামাদ

"গত ২২ জানুয়ারী পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম জামাতে ইসলামীর সাংসদ জনাব মতিউর রহমান নিজামী কোরাআন ও হুজুর পাক (সাঃ)-এর অবমাননার শাস্তি সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করেছেন। আইন প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ, অনুভূতিপ্রবণ, ও স্পর্শকাতর উল্লেখ করে বিশদ আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখতে বলেছেন। জনাব নিজামী তার প্রস্তাবিত বিলে বলেছেন, পবিত্র কোরআন ও হুজুর পাকের (সাঃ) অবমাননা শাস্তিস্বরূপ বাংলাদেশের আইনে এই মর্মে একটি ধারা সন্নিবেশ করতে হবে যাতে জরিমানা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ থাকে। বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবমাননা কোন মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। কেননা পবিত্র কোরআন আমাদের জীবন বিধান আর হযরত মুহাম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত রছুল আমাদের মহানবী।এ দু'য়ের অবমাননা কোন ক্রমেই সহ্য করা যায় না।

পবিত্র কোরআন শুধু একটি ধর্মগ্রন্থই নয়, একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানও। মানুষের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে। কি ধরনের অন্যায় করলে একজন মানুষের কি পরিমাণ বিচার হবে সে নির্দেশও কোরআন দিয়েছে। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যদি কোরআনের প্রতিটি নির্দেশ, ও সতর্কবাণী মেনে চলে তাহলে কোন অশান্তিই পৃথিবীতে থাকতে পারে না। অনাবিল ও নিরুপদ্রব শান্তি নিশ্চিত করতে মানুষের তৈরি কোন আইনের প্রয়োজনও পড়ে না।কেন না মানুষের তৈরি আইনে অসংখ্য ফাঁক-ফোকর থাকে যা কোরআনের বিধানে নেই। এসব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। তিনি যে দলের প্রথম সারির একজন কাণ্ডারী সে দলের লিখিত আদর্শ-উদ্দেশ্যও কোরআন এবং ছুন্নাহ ভিত্তিক, অন্ততঃ তাদের দাবি অনুসারে আমরা তাই জানি। জনাব নিজামী এবং তার দল বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার লক্ষ্যেই নাকি মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। প্রশ্ন হলো, যদি তিনি ও তার দল ইসলামী হুকুমতই কায়েম করতে চান তাহলে পবিত্র কোরআন, সুন্নত ও শরিয়তে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে বাংলাদেশের আইনে একটি নতুন ধারা সন্নিবেশ করাতে চাইছেন কেন? কোরআন এবং মহানবীর (সাঃ) অবমাননার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন কি

কিছু বলেছে? কোরআন যখন মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান তখন উল্লেখিত ব্যাপারেও কোরআনে অবশ্যই কিছু ইংগিত রয়েছে। দুঃখের বিষয়, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী উথাপিত বিলটিতে কোরআনের কোন রেফারেন্স না এনে ইংল্যান্ডের PUNISHMENT OF BLASPHAMY (ঈশ্বর নিন্দার শাস্তি)-কে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে আমরা মনে করতে পারি যে, কোরআন ও হুজুর পাক (সাঃ)-এর আবমাননার ব্যাপারে কোন শাস্তির বিধান কোরআনে নেই অথবা কোরআন ও হুজুর পাক (সাঃ)(-এর অবমাননার কোন শাস্তি কোরআন সুন্নত ও শরিয়ত দ্বারা প্রমাণযোগ্য নয়। আর সেকারণেই তিনি PUNISHMENT OF BLASPHAMY রেফারেন্স উল্লেখকরতে বাধ্য হয়েছেন।

একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, কোরআন আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আর হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহ প্রেরিত রছূল। কোরআন এবং নবীকে আল্লাহ্ স্বয়ং প্রেরণ করেছেন মানুষের জন্যে। এখানে আল্লাহ্ হলেন সর্ব প্রধান। কোরআন এবং হুজুর পাকের (সাঃ) মর্যাদা আল্লাহ্রই সৌজন্যে। অথচ মাওলানা নিজামী আল্লাহ্র মর্যাদাকে বাদ দিয়ে রেসালতের মর্যাদা সংরক্ষণে অধিক ব্রতী হয়েছেন। পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে তিনি কোরআন ও সুন্নতকে বাদ দিয়ে কোরআনের পূর্ণতার উপরেই মারাত্মকভাবে আঘাত করেছেন। যা স্বাভাবিক ভাবেই পবিত্র কোরআনের অবমাননার শামিল। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আইন প্রণয়ন করতে হলে তা কোরআন, সুন্নত ও শরিয়ত অনুসারেই করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। পবিত্র কোরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ্। এ বিষয়ে তিনি অঙ্গীকারও করেছেন। আর মহানবী তাঁর জীবদ্দশায়ই অবমাননাকারীদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। শুধু অবমাননাকারীই নয় তাঁকে দৈহিকভাবে যারা নির্যাতন করেছে তাদেরকে পর্যন্ত তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তায়েফের ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সুতরাং কোরআন ও মহানবীর অবমাননার শাস্তি বিধানে নতুন করে কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে কি না বিষয়টি দেশের বিদগ্ধ আলেম সমাজের ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। অনুরোধ করছি এ জন্য যে, বর্তমানে মানুষের ঈমানের জোর খুব ক্ষীণ হয়ে আসছে। মিথ্যাচার, ব্যভিচার, জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি, লোভ-লালসা ইত্যাদি নেতিবাচক গুণাবলীতে অধিকাংশ মানুষ বিজরিত। সঙ্গত কারণেই মানুষের তৈরি আইনের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে মিথ্যে সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত আইনে যেকোন মানুষকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলানো অতি সহজ। জানি না মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ বিষয়ে তার জ্ঞানের ভান্ডারে খানিক নাড়াচারা করেছেন কি না। নাকি তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেই এ বিল তিনি সংসদে

উত্থাপন করেছেন ? এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব উদাহরণ এখানে তুলে ধরলাম। কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তানে এ ধরণের একটি আইন সেদেশের পার্লামেন্টে পাস হয়েছে। যার পরিণামে একজন খৃষ্টানের মৃত্যুদন্ডদেয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গুল মসীহ্ নামে এক খৃষ্টান কল থেকে পানি আনার সময় একজন মুসলমানের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। একে অপরকে গালমন্দ করে। পরে উক্ত মুসলমান বাদী হয়ে গুল মসিহের বিরুদ্ধে ২৫৯ (সি)-এর আওতায় একটি মামলা দায়ের করে। মুসলমান তার লোকজন নিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে গুল মসিহর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করে। ফলে আদালত তাকে মৃত্যুদন্ড প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছে তাই উল্লেখিত ধারা মতে আসামীর যে দন্ড হওয়া প্রয়োজন, সে দন্ডই প্রদান করেছে। কিন্তু যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন আসতে পারে। আসাটাই স্বাভাবিক, যেহেতু পৃথিবীর সবদেশেই এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায় মারমুখী। তাছাড়া ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণেও এ ধরনের বিচার প্রহসন অনুষ্ঠিত হতে পারে বৈকি।

একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, বাঙ্গালী জাতি আজ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি অংশে রয়েছে স্বাধীনতার স্বপক্ষের মানুষ অপর অংশ স্বাধীনতার বিরোধী ঘাতক চক্র। স্বাধীনতা বিরোধী চক্র চলনে-বলনে, লেবাসে-ছুরতে ইসলামের ঝান্ডাবাহী। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারাই আজ ধর্মের রক্ষক সেজে বসে আছে। বিলটিও এসেছে তাদেরই মাধ্যমে। সঙ্গত কারণেই আরেকটি মোক্ষম অস্ত্র শান দিচ্ছেন একাত্তরের ন্যায় এদেশের মানুষকে হত্যা করার লক্ষ্যে। একাত্তুরে তারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ক্যামোফ্ল্যাজ করে মানুষ হত্যা করেছে, এ বিল পাস হলে সে মুখোশ আর পরতে হবে না। রাষ্ট্রীয় অনুমোদনেই সিদ্ধি লাভে সমর্থ হবে। এতদিন আল্লাহ্‌র নামে মানুষ কতল করছে, এবার কোরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর অবমাননা ঠেকানোর নামে ফাঁসিতে ঝুলাবেন। কেননা এ কাজ করতে তাদের সাক্ষীর কোন অভাব হবে না। কোরআন ও নবীকে অবমাননা করেছে এই কথা বলে যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা আদালতে মামলা ঠুকবে, নিজেরাই সাক্ষী দিয়ে অভিযুক্তকে ফাঁসিতে ঝুলাবে। এতে অবৈধ অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না প্রতিপক্ষের পায়ের রগও কাটতে হবে না। এতে কারো ফাঁসি হলেও পায়ের রগ কাটার যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাবে বৈকি?

পৃথিবীতে ৪৬টি মুসলিম দেশ রয়েছে। পাকিস্তান ব্যতীত কোন মুসলিম দেশে এ ধরনের আইন পাস করা হয়নি। কেবল এ আইনই নয়, অধিকাংশ মুসলিম দেশেই কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অনেক বিধি-বিধান চালু করা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রায় সকল মুসলিম দেশেই অন্যান্য ধর্মের লোকজন বসবাস

করে। তাছাড়া সবগুলো মুসলিম দেশই পৃথিবী নামক গ্রহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাজেই মুসলমান সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপবাসীও নয়। বিজ্ঞানের সাফল্য পৃথিবীকে অনেক ছোট করে এনেছে। সমগ্র বিশ্ব আর একটি পরিবারের রূপ ধারণ করেছে। স্বভাবতঃই যখনই কোন দেশে একটি আইন প্রণীত হয় তার পূর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার বিশ্লেষণও করা হয়। স্মরণ রাখা হয় যে, এক দেশের প্রণীত আইন প্রতিবেশী কোন দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কিনা সে বিষয়েও।বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি আজো। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় যাদের জীবনসঙ্গী, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন যাদের বিপন্ন তাদের জীবন ধারণের নিশ্চয়তা বিধান না করে, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করে এমনকি নিরক্ষর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির কল্যাণে কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নিয়ে জামা'তে ইসলামী জাতির কি সেবা করতে চায় ? তারা কি ঐ সকল লোকেদের উপর অত্যাচারের তরবারি হাকাতে চায় যারা তাদেরকে ভোট দেয়নি ? জনাব নিজামীর কি পূনরায় মুসলমানদের বুকের তাজা রক্ত পান করতে উদ্যত? অন্ততঃ উল্লেখিত বিল উথাপনের মধ্যে দিয়ে এসব আশংকাই নতুন করে বাংলার প্রগতিশীল মানুষের মনে বিভীষিকার ন্যায় দেখা দিয়েছে। এমন কোন মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি পবিত্র কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করতে পারেন। আমি মনে করি প্রতিটি মুসলমান বিশেষ করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতভুক্ত যারা তারা প্রত্যেকেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নূর মনে করেন। অধিকাংশ মুসলমানই পবিত্র মিলাদ মাহফিলে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হুজুর পাকের (সাঃ) নাম উচ্চারণ করে থাকে। সঙ্গত কারণেই পবিত্র কোরআন এবং হুজুর পাকের (সাঃ) অবমাননা হতে পারে এমন কোন কর্ম কোন মুসলমানই করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এখন অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রশ্ন আসতে পারে। এ ব্যাপারে আমি মনে করি, অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে তবে সেটা তাদের নিজ নিজ ধর্মের চেয়ে বেশি নয়। কেননা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত এবং অনুগত তা না হলে তারাও পবিত্র ইসলামের অনুগত হতো। কিন্তু তারা ইসলামের প্রতি অনুগত নয় বলেই তাদের কাছে পবিত্র কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যথাযথ মর্যাদাও আশা করা যায় না। আর মর্যাদার বিষয়টি জোর করে আদায় করাও যায় না। তাছাড়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জীবিত থাকা অবস্থায়ই অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে নানাভাবে অবজ্ঞা অবহেলা করেছে। শুধু তাই নয়, নবীজীর উপর অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতনও চালিয়েছে। সেজন্য মহানবী আইন করে নির্যাতনকারীদের বিচার করেননি বা পরবর্তীতে বিচার করার জন্যে কোন নির্দেশও দিয়ে যাননি।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের মধ্যে ৭০টি ফেরকা বিরাজমান। এসব ফেরকার মধ্যে মতানৈক্যও প্রচুর। এর মধ্যে জামাতে ইসলামীও রয়েছে। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদী কোরআন সম্পর্কে লিখেছেন ''এই গ্রন্থে রচনার কোন ধারাবাহিকতা নেই, তাছাড়া কিতাবী রূপও নেই (তফহীমূল কোরআন, উর্দু পৃঃ ২০ প্রথমে খন্ড) শুধু তাই নয়, তিনি সূরা ফাতহার আয়াত নং ১০-এ নাকি আলাইহীর স্থলে ভুলে ''আলায়হু " লেখা হয়ে গেছে (তফহীমূল কোরআনঃ ১৫ খন্ড, ৪৮পৃঃ)। তফহীমূল কোরআনের ১৮ খন্ডের ১৩১পৃষ্ঠায় মওলানা মওদুদী হুজুর পাক (সাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন ''প্রথম দিকে নবী করীম (সাঃ) ওহী গ্রহণের পুরোপুরি যোগ্যতা লাভ করেননি। সাংসদ মতিউর রহমান নিজামী এবং তার দল জামাতে ইসলামী মওলানা মওদুদীর আদর্শের অনুসারী। এ ক্ষেত্রে মওলানা মওদুদী পবিত্র কোরআন ও হুজুর পাক (সাঃ) সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তা পবিত্র কোরআন ও মহানবী (সাঃ)-এর অবমাননারই শামিল নয় কি?

আজকে নিজামী সাহেব যে বিলটি সংসদে উত্থাপন করেছেন তা যদি পাস করা হয়। তাহলে ভারতের ২২ কোটি মুসলমানের আবস্থা কি হবে সে কথাটা কি তিনি এবং তার দল একবারও ভেবে দেখেছেন? বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে ভারতে মুসলমানদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তারপর বাংলাদেশে এধরনের একটি বিল পাস হলে সেদেশে একটি মুসলমানও জীবিত থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় এ বিল পেশ করবার পেছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের মানুষ আমরা। এখনো এদেশের আশি ভাগ মানুষই নিরক্ষর। পঁচাশি ভাগ মানুষের জীব যাত্রার মান দারিদ্র্য সীমারও নীচে। ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন, সংস্কৃতির পশ্চাৎ পদতা ইত্যাদির পাশাপাশি পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি আইন কেবল অশান্তিরই সৃষ্টি করবে বলে সচেতন মহলের বদ্ধমূল ধারণা। এ বিল আমাদের জাতীয় ঐক্য, সংহতি, শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট করে জাতিকে অনৈক্য, অস্থিরতা ও অসংহতির দিকেই ঠেলে দিবে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথও হবে রুদ্ধ।

❑ *(দৈনিক লাল সবুজঃ ২৯ জানুয়ারী-১৯৯৩, সৌজন্যে)*

জা' আল হক্

দেওবন্দী ওহাবীদের অভিনব ধর্ম বিশ্বাস

মৌলানা কমর রব্বি আল্ হায়দার

গত ১৪ই জানুয়ারী দৈনিক আজকের কাগজে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। দেশের ২৫১ জন বিশিষ্ট উলামা এক যৌথ বিবৃতিতে জামাতে ইসলামী ও ওহাবীদের খপ্পর থেকে নিজ নিজ ঈমান রক্ষা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর দু'জন প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেমের প্রতি তারা নাম উল্লেখ পূর্বক নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। উক্ত আলেমদ্বয় হলেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মৌলানা ওবায়দুল হক এবং শায়খুল হাদিস মৌলানা আজিজুল হক। নানা কারণে উক্ত দুই মৌলানা ইদানিং বহুলভাবে আলোচিত। কৌতহলবশতঃ আমি দেওবন্দী মৌলানাদের মতবাদ ও ধরন নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি। এতে যা জানতে পারলাম তার কিয়দংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।

দেওবন্দী ও ওহাবী উভয় সম্প্রদায় সংস্কারমুক্ত ধর্ম পালন করাব দাবীদার। পীরপুজা, কবরপুজা, ইত্যাদির বিষয়ের বিপক্ষে তারা প্রায়ই বক্তব্য রেখে থাকেন। তাদের যুক্তি পরিবেশন ও আকৃতি প্রকৃতি দেখে আমরা অনেকেই তাদের প্রকৃত রূপ চিনতে ভুল করি।

দেওবন্দীরা আল্লাহ্'তালার কুদরতের (অসীম ক্ষমতা) বিষয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে একথাও উল্লেখ করছেন যে, খোদাতা'লা মিথ্যা কথা বলার ক্ষমতা রাখেন (নাউযুবিল্লাহ) (দেখুনঃ 'ফাতাওয়া রশীদিয়া', প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৯)। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু হচ্ছেন পূতঃ পবিত্র সত্তা যার মধ্যে কোন দুর্বলতা বা দোষ নেই। আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা আর তাঁর সব উত্তম গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি। আজ পর্যন্ত যে কাজ অমুসলমানও সম্পাদন করতে পারেনি দেওবন্দীরা তাই সার্থকভাবে করে দেখিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র সত্তার উপর হস্তক্ষেপ করতে তারা ক্ষান্ত হননি বরং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এরও চরম অবমাননা করেছেন। তাদের মতে, শয়তানদের জ্ঞান নাকি হুযুর পাক (সঃ)-এর চেয়েও বেশী ছিল (মৌলানা খলিল আহমদ প্রণীত 'বারাহীনে কাতেয়া'-মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুলী দ্বারা সত্যায়িত,পৃঃ ৫১-। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন রহমতুল্লিল আলামীন। খোদাতা'লা স্বয়ং তাঁকে

এই উপাধি প্রদান করেছেন। কিন্তু দেওবন্দীরা মহানবী (সাঃ) ছাড়াও হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবকে এবং মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেবকেও রহমতুল্লিল আলামীন' নামে আখ্যায়িত করেন (ইফাযাতুল ইয়াওমিয়া, (মৌলানা থানভী প্রণীত) প্রথম খন্ড, পৃঃ১০৫ এবং মাসিক 'দেওবন্দ' ও মাসিক 'নূরীকিরণ বেরেলী থেকে প্রকাশিত, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) দেওবন্দীদের তৃতীয় ইমাম মৌলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী প্রশ্নের উত্তরে ফতোয়া দিয়েছেন 'রহমাতুল্লিল আলামীন' শব্দটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য শুধু নির্ধারিত নয় ? (ফতাওয়া রশীদিয়া, পৃঃ ৯৬, সাইদী প্রেস, কোরআন মহল, করাচী)। এখানেই শেষ নয়। দেওবন্দীদের মতে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাজারের সবুজ গম্বুজ এবং হযরত ইমাম হোসেইন (রাঃ) আর হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানি (রহমঃ)- এর মাজার শরীফ নাজায়েয ও হারাম (নাউযুবিল্লাহ) (ফাতাওয়া দেওবন্দ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪)। কবর পুজা এক জিনিষ, আর কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তি রূহের মাগফেরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কিন্তু এদের মতে এ সবকিছুই অবৈধ। মুসলমান মাত্রই পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'তে বিশ্বাসী। এবার তবে দেওবন্দীদের কলেমা শুনুন 'আল ইমদাদ' পত্রিকার সফর, ১৩৭৬ হিজরীতে প্রকাশিত মৌলানা আশরাফ আলী থানভী সংখ্যার ৪৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্"। তাদের দরূদ হলোঃ ''আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নবীয়্যেনা ওয়া মৌলানা আশরাফ আলী" (মা আযাল্লাহে)।

দেওবন্দীদের ধৃষ্টতার আরেকটি উদাহরণ দেখুন। আমাদের সবার ধর্মশিক্ষক হচ্ছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। তাঁর কাছ থেকেই আমরা ধর্ম শিক্ষা লাভ করেছি কিন্তু দেওবন্দীদের দাবী হচ্ছে তারা নাকি হুজুর (সাঃ) কেও শেখাতে পারেন। তারা বলেন, উর্দু শেখার বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দেওবন্দীদের ছাত্র"। নাউযুবিলাহ্ নাউযুবিলাহ্। দেওবন্দী মজহব পুস্তক, বরাহীনে কাতেয়া, ২৬ পৃঃ)

উপরের আলোচনা থেকে একথা নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, ২৫১ জন বিশিষ্ট আলেম কি কারণে জামাতী এবং ওহাবীদের সাথে দেওবন্দীদের উল্লেখ করেছেন। বিবৃতি প্রদানকারী মুফতি মৌলানা ওবায়দুল হক ফিরোজ, মৌলানা আব্দুস সালাম প্রমুখের দেশবাসীর ঈমান সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হবার পেছনে অবশ্যই যথার্থ কারণ রয়েছে। একবার যদি জামাতী দেওবন্দী ওহাবী মৌলানারা ধর্ম জগতে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয় তাহলে খাঁটি ইসলামের কি দশা হবে সেটিই ভাববার বিষয়।

❑ (সাপ্তাহিক জা'আল হক্ঃ১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যার সৌজন্যে।

এ কি ষড়যন্ত্র!

আব্দুল রব

চিন্তা করে শিউরে উঠেছি যে, আমরা কিভাবে ধরা ছোঁয়ার অচেতন কায়দায় ও অদৃশ্য পন্থায় ধর্মীয় উম্মাদদের বন্ধনীর ভেতর আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছি এ ধর্মীয় উম্মাদনা আমাদের কোথায় নিয়ে পৌছাবে? দুনিয়ার প্রায় দেশই কোন না কোন সময় ধর্মীয় উম্মাদদের ভয়াবহ নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। যথা ইংল্যান্ডে ঈশ্বর-এর (চার্চের) শাসন এবং রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার সমূহের নামে যা কিছু ঘটেছিল আর তেমনি Inquisition -এর নামে মানবতা বিধ্বংসী ন্যক্কারজনক জুলুম-অত্যাচার ধর্মের দোহাই দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল-তা ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায় যা এখন সে সব দেশের বিগত কালের উপাখ্যান হয়ে আছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ যেভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উম্মাদনার দিকে ধেয়ে চলেছে এর পরিপ্রক্ষিতে নিকট অতীতের কিছু ঘটনাবলী স্মৃতি পটে ভেসে উঠেছে। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানেরই একটা অংশ ছিল সে সময় উভয় অংশে এ সকল ধর্মীয় গোঁড়া পন্থীরা যে ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তার কিছু চিত্র তদানীন্তন ইসলামিক কালচার সোসাইটি-এর সভাপতি ডঃ খলিফা আব্দুল হাকিম তার রচিত ইকবাল ও মোল্লা গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় এভাবে তুলে ধরেছেন-''পাকিস্তানের এক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একজন বড় মোল্লা এবং প্রভাবশালী আলেম যিনি কিছু কাল হল অনেক দ্বিধাদ্বন্দ, দোটানাভাব এবং বিচার-বিবেচনার পর হিজরত করে পাকিস্তানে চলে এসেছেন, তাকে আমি একটি ইসলামী ফির্কা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তার উত্তরে তিনি ফতওয়া দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা ''ওয়াজেবুল কতল'' (আবশ্যিকভাবে হত্যা যোগ্য) আর উগ্র ও চরমপন্থী নয় তারা আবশ্যিকভাবে শাস্তিযোগ্য। আর একটি ফির্কা যাদের মধ্যে বহু কোটিপতি ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, বললেন যে,ওরা সকলেই ''ওয়াজেবুল কতল''। ঐ আলেমই ছিলেন ঐ বত্রিশ জন ওলামার সর্বাগ্রে এবং হর্তাকর্তা বিশেষ যারা নিজেদের প্রস্তাবিত ইসলামী গঠনতন্ত্রের মধ্যে এটা জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় বলে নির্ধারণ করেছেন যে, একটি ব্যতিরেকে প্রতিটি ইসলামী ফির্কাকেই স্বীকৃতি দেয়া হোক। সে ফির্কাটি

ইসলাম বহির্ভূত বলে বিবেচিত হোক তারাও ওয়াজেবুল কতলই বটে। তবে এখনই তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলার কথা নয়। সময় সুযোগ যখন আসবে তখন দেখা যাবে। তাদেরই মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় আলেম-দীন বললেন, এখন সবে মাত্র আমরা একটি ফির্কার বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ শুরু করেছি। এতে সফলতা লাভের পর ইনশাল্লাহ্ অন্যান্যগুলোর পালাও আসবে (ডঃ খলিফা আব্দুল হাকিম এম.এ.পি. এইচ.ডি প্রণীত ''ইকবাল আউর মোল্লা'' পৃঃ ১৯ প্রকাশনায় বযমে ইকবাল, লাহোর) এই ভেবে শিউরে উঠি যে, এই আন্দোলন কেবল একটি ফির্কার বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি পালাক্রমে। ধীরে ধীরে সমগ্র উম্মতের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজির এক গভীর ষড়যন্ত্র। প্রথমে একটিকে ইসলাম বহির্ভূত করা হবে তারপর অন্যান্যগুলোকে যার সাক্ষ্য সে সময়ে এভাবে পাওয় যায় যে, ১৯৫৩ সালে কাদীয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়ার পাশাপাশি দেওবন্দীদেরও এক পৃথক সংখ্যালঘু ফির্কা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি পাকিস্তানে উথাপিত হয়। দেওবন্দী ফির্কাকে ''বৃটিশ রাজত্বের, ছত্রছায়ায় জন্মগ্রহণকারী এক ফির্কা''বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং বলা হয় যে, ''তারা ইবনে সউদ রাজতান্ত্রিক সরকারের চাপিয়ে দেয়া বিধি-নিষেধসমুহ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের উপরে কার্যকর করতে চায় এবং আরও মন্তব্য করা হয় যে, ''শিখরা যেমন হিন্দুদের মধ্য থেকে উৎপন্ন হলেও হিন্দু নয় কিংবা ইংল্যান্ডের পোটেষ্ট্যান্টরা রোমান ক্যাথলিকদের মধ্য থেকে বেরুলেও রোমান ক্যাথলিক নয়, তেমনি দেওবন্দী ফির্কার উৎপত্তি ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মধ্য থেকে হলেও তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নয়। তাই বেরেলভী আলেমগণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে এদাবী করেন যে, দেওবন্দী ফির্কাকে একটি সংখ্যালঘু ফির্কা হিসেবে ঘোষণা করা হোক'' (মাসিক ''তুলুয়ে ইসলাম'' মে, ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত দাবীনামার সার সংক্ষেপ)। অনুরূপভাবে শিয়াদের পত্রিকা "আল-মুস্তাজির" ১৯৭০ সালে উলামা-এ পাকিস্তান-এর দাবির বিরুদ্ধে নিম্নরূপ সমালোচনা প্রকাশ করেছিলঃ-

জমিয়তের সাংবিধানিক নীতিমালা প্রণয়নকারীরা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে নিজেদের ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী ফির্কাসমূহকে অমুসলিম সাব্যস্ত করার জন্যও দফা জুড়ে দিয়েছিল। 'খতমে নবুয়ত' এর নামে আন্দোলন নিছক একটি ছলনা মাত্র। তাহা হইলে 'ইত্যাদি' শব্দটির মধ্যে এতো ব্যাপকতা রয়েছে যে, মুফতি মাহমুদ এবং গোলাম গওস হাযারভী ইসলামের যে কোন ফির্কাকে ইসলামী সাব্যস্ত করে ছাড়বেন (''আল মুস্তাজির'' লাহোর ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ পৃঃ-১০)।

আবার ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের মুলতানে অনুষ্ঠিত খিলাফতে রাশেদা কনফারেন্সে শিয়াদেরকে পৃথকীকরণের দাবি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। খিলাফতে রাশেদা কনফারেন্স মুলতানের এই মহাসম্মেলন পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবি জানায় যে, শিয়ারা যখন মুসলমানদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র আওকাফ এবং আলাদা শিক্ষা সিলেবাসের জন্য দাবি করে মিল্লাত হতে বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ দিয়েছে এবং এইরূপে কার্যতঃ তারা এই দাবিই করেছে যে, তারা সাধারণ মুসলমানদের থেকে একটা স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু ফির্কা এবং সরকারও যখন তাদের পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন তখন শিয়াদেরকে (রাষ্ট্রের) প্রতিটি স্তরে পৃথক করে দেয়া হোক। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোকে এবং চাকুরির সকল পদগুলোতে তাদেরকে তাদের জন সংখ্যা অনুপাতে অংশ দেয়া হোক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আজ সুন্নী বেচারা নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং অধিকাংশ উর্ধ্বতন ও উচ্চপদগুলোতে এবং ক্ষমতার শীর্ষ আসনগুলোতে শিয়াদেরই দেখা যা।য় "সাওয়াদে আযমের (অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নীদের) জোরালে দাবি এই যে, সরকার এই বিচ্ছিন্নতা প্রিয় ফির্কাটিকে চাকুরি 'ইত্যাদি'তে পৃথক করে দিক ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে এবং উর্ধ্বতন উচ্চপদগুলোতে তাদের সংখ্যার অনুপাতে অংশ দিক। প্রস্তাবকারী হযরত মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ সমর্থনকারী হযরত মৌলানা কায়েম উদ্দীন। *(সাপ্তাহিক তারজুমান ইসলাম লাহোর ৩১ মার্চ, ১৯৭২ কলাম ৫)।*

শিয়াদের সম্পর্কে মাওলানা হানীফ নদভী লিখেছেন ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে নবুওয়তের পাশাপাশি যুগপৎ ইমামতের একটি সমান্তরাল প্রবহমান ধারা রয়েছে অর্থাৎ যেমন নবীদের আবির্ভাব জরুরী। তেমনি ইমামদের লকব উপাধিকরণ) অত্যাবশ্যকীয়। কার্যতঃ নবুওয়তের প্রবহমানতা এবং ইমামতের প্রবহমানতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (মির্যাইয়াত নায়ে খাবিউসে)। দেখা গেলো কাদিয়ানীরাও খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী তেমনি শিয়ারাও ইমামত সম্বন্ধীয় নিজেদের আকিদার কারণে খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হলো। অন্যদিকে আবার আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে দেওবন্দীদের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবীকেও খতমে নবুওয়তের আকিদার অস্বীকারকারী বলে বর্ণনা করা হয়। তাদের সে ফতওয়া অনুযায়ী প্রায়শঃ এ মন্তব্য করা হয় যে, মৌলানা কাশেম নানুতবী তাঁর রচিত তাহযীরুন্নাস গ্রন্থে নিম্নরূপ লেখার দ্বারা নবুওয়তের পথ খুলে দিয়েছেন, 'যদি ধরে নেয়া হয় যে, নবী (সাঃ)-এর পরেও কোন নবী আবির্ভূত হন তাহলেও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়তের কোন বাধা ঘটে না।' তাহলে বুঝা গেল দেওবন্দীরাও খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী বলে সাব্যস্ত হয়ে গেলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,

কাদীয়ানীরাও খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী। শিয়ারাও ইমামতের কারণে খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী সব দেওবন্দীরাও খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী - তাহলে বাঁচল কে। এটা উম্মতকে বিভক্তিকরণ ও ফির্কাগুলোকে পরস্পর লড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র নয় কি? এটা সেই ষড়যন্ত্র যার উল্লেখ ডঃ খলীফা আব্দুল হাকীম করেছিলেন।

উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্বন্ধে ১৯৫৩ সনে মওদুদী সাহেব এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই কার্যক্রম থেকে দু'টি বিষয় আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। একটি হলো এই যে, আহরারদের সামনে আসল প্রশ্ন খতমে নবুওয়ত-এর সংরক্ষণ নয় এবং তাদের উদ্দেশ্য নাম-ধাম এবং কৃতিত্ব লাভ। বস্তুতঃ এই লোকগুলো নিজেদের পরিকল্পিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদকে জুয়ার চাল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ রাতের বেলায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়ার পর আবার তারা কয়েকজন মিলে পৃথক বসে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকায় এবং ভিন্ন একটা প্রস্তাব নিজেদের পক্ষ থেকে লিখে আনে। আমি অনুধাবন করেছি যে, তাতে মঙ্গল হতে পারে না। এবং নিজেদের হীন স্বার্থাবলী চরিতার্থে খোদা ও রসূলের নামকে হেয় প্রতিপন্নকারী যারা মুসলমানদের জীবন দাবার ঘুঁটির ন্যায় ব্যবহার করে তারা কখনও আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্বারা ভূষিত হয়ে সফলকাম হতে পারে না। *(দৈনিক 'তাসনীম' লাহোর ২ জানুয়ারী, ১৯৫৫)।*

আমাদের দেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে যে রং তামাশা ও নাটক অভিনীত হয়ে চলছে-এর মধেও সে একই ষড়যন্ত্র পাকিস্তান হতে আমদানী করা হচ্ছে যাকে চালাবার জন্য সেই তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়তের উলামা পাকিস্তান থেকে আসছেন, সেই একই দেওবন্দী উলামা বাংলাদেশ থেকে অংশ নিচ্ছেন। আর সে একই দাবি কাদীয়ানীদের বিরুদ্ধে পূনঃ উথাপিত হচ্ছে। পরবর্তীতে শিয়া এবং দেওবন্দীদের সম্পর্কে যে একই ধরনের দাবি উথাপিত হবে না তার নিশ্চয়তাই বা-কি? আর সেই সাথে একই ধরনের কার্যক্রমের দ্বারা আমাদের দেশটিকে গণতন্ত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি ও মোল্লাতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তা চিন্তা করে আমি আপাদ-মস্তক শিউরে উঠেছি। আমাদের প্রিয় দেশবাসীও কি সেই আশংকাটি ঠাহর করতে পারছেন- এই সেই প্রশ্ন যা আমার মনকে তোলপাড় করে চলেছে। হায়! প্রিয় দেশবাসী আমরা সকলেই যদি এ পথের ঘোর বিপদাবলীকে অনুধাবন করতে এবং সে সম্বন্ধে সচেতন হতে পারতাম!

❑ *(দৈনিক লাল সবুজ ঃ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং তারিখের সৌজন্যে)*

চিঠিপত্র

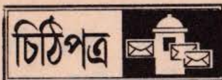
মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

'লং মার্চ না প্রহসন'

৫৫ হাজার ১শ' ২৬ বর্গমাইল জুড়ে যে দেশটি অবস্থিত নাম তার বাংলাদেশ। দেশটি '৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পশ্চিমা হানাদার বাহিনী হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। হয়ে যায় সীমানা নির্ধারণ। আইনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে প্রয়োজন হয় ভিসার, অন্যদেশ থেকে এদেশে আসতে হলেও ভিসার প্রয়োজন হয়। গত ৬ ডিসেম্বর '৯২ ভারতের মৌলবাদী দলের সদস্যরা ধ্বংস করে দেয় বহু বৎসরের পুরানো বাবরী মসজিদকে। শুরু হয়ে যায় দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ সুযোগে আমাদের দেশে ওঁতপেতে থাকা কতিপয় সুবিধাবাদী মোল্লামৌলবী ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে ২ মার্চ ঘোষণা দেয় অযোধ্যা অভিমুখে লং মার্চের। যে সকল বন্ধুরা এ কর্মসূচী ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ঐ দিন লং মার্চে যে সকল সরল প্রাণ মুসলমান বন্ধুরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের কি বৈধ ভিসা ছিল ভারতে যাবার? আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা নূহতে বলেন, হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর। ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। কারণে অকারণে লোক দেখানো কর্মসূচী দিয়ে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার অধিকার কে দিয়েছে। ঝরে যাওয়া ৫টি প্রাণ ফিরিয়ে দিবেন কে? শান্তির নীড় নাম খ্যাত বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করলে বাংলার জনগণ টুপি পরা, দাঁড়িওয়ালা, কাটমোল্লাদেরকে ক্ষমা করবে না, যে রূপ করেনি '৭১ সালে। আল্লাহ্‌তায়ালা লং মার্চ কর্মসূচী ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিবর্গকে সত্যিকার মোমেন হওয়ার তৌফিক দান করুন।

—এম, এ, হোসেন

[দৈনিক লাল সবুজ ঃ ৪/২। '৯৩ তারিখের সৌজন্যে]



মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ধর্মমন্ত্রী ও ধর্ম নিরপেক্ষতা

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ধর্মমন্ত্রীর কোন পদ নেই। ধর্ম নিয়ে যেসব দেশে বিতন্ডা বেশি সেই সব দেশেই রয়েছে ধর্মমন্ত্রীর পদ।

আমাদের উপমহাদেশে সর্ব প্রথম ধর্মমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয় পাকিস্তানে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর বাংলাদেশে সংবিধান থেকে যখন ধর্ম নিরপেক্ষতাকে উচ্ছেদ করা হয় তখন পাকিস্তানী ষ্টাইলে বাংলাদেশে ধর্মমন্ত্রীর আবির্ভাব ঘটে। এযাবৎ প্রায় চৌদ্দজন ধর্মমন্ত্রী বা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এই আসনে আসীন হয়েছেন।

এ পর্যন্ত যত ধর্মমন্ত্রী হয়েছেন তারা সবাই ধর্মে মুসলমান। কোন অমুসলমান আজ পর্যন্ত ধর্মমন্ত্রীর পদলাভ করতে সক্ষম হননি। ভবিষ্যতেও কোন অমুসলমান এই পদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন বলে মনে হয় না। কারণ অতি সুস্পষ্ট। আমাদের সংবিধান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, মানুষের পক্ষে (যদি সে কোন একটি ধর্মে বিশ্বাসী হয় তাহলে) ধর্ম নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। একজন ধর্ম বিশ্বাসী তার নিজের ধর্মের প্রতিই বিশ্বাসী থাকবে। অন্য ধর্মের প্রতি তার কোন মতেই আন্তরিকতা থাকতে পারে না। তার কাছে তার নিজস্ব ধর্ম মতটিই সত্য, অন্য সব ধর্ম হয় মিথ্যা, নয় বিকৃত। একজন মুসলমান ধর্মমন্ত্রী মূর্তি পূজোর সমর্থনে অথবা ত্রিত্ববাদের প্রসারে কখনও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি তিনি মন্দির, গীর্জা ইত্যাদির উন্নয়নের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে তা কখনও আন্তরিক হবে না। নিজের পদের খাতিরে তিনি এতে বাহ্যত অংশ গ্রহণ করলেও অন্তরে অবশ্যই তিনি এসব কর্মকে অসহ্য জ্ঞান করবেন। এক কথায় তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারবেন না।

যদি কেউ বলেন যে, নিজ ধর্মে বিশ্বাসী থেকেও পর ধর্মের প্রতি ন্যায় বিচার করা যায় বা নিরপেক্ষ থাকা যায়। তাহলে সেই একই প্রশ্ন এস দাঁড়ায় অর্থাৎ তাহলে রাষ্ট্রর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধর্মে নিরপেক্ষ থাকা যায় না কেন? রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে ধর্মের বেলায় কি করে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব?

আমরা মনে করি ধর্মমন্ত্রীর পদটিই একটি অপ্রয়োজনীয় পদ। আর যদি ধর্মমন্ত্রী রাখতেই হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে মুসলমান, হিন্দু খৃষ্টান এবং বৌদ্ধদের মধ্য থেকে এক একজন করে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নেওয়া হোক। যারা নিজ নিজ ধর্মের উন্নয়নের যথাযথ কাজ করে যাবেন এবং নিজেকর্মের স্বার্থ রক্ষা করবেন। আন্তঃধর্মের এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলো সকল প্রতিমন্ত্রী মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করবেন।

❑ এন্টনি থমাস চৌধুরী

(দৈনিক লাল সবুজ ঃ ৪/২। '৯৩ তারিখের সৌজন্যে)